প্রাইভেট লাইফ অফ
ইয়াহিয়া খান

দেওয়ান বারীন্দ্রনাথ

অনুবাদ। রাফিক হারিরি

নির্মল পরিচ্ছন্ন অকপট ভাষায় এক দুঃসাহসিক কলমের অভিযান হলো 'প্রাইভেট লাইফ অব ইয়াহিয়া খান'। ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক দেওয়ান বারীন্দ্রনাথ তার লেখনীর ভিতর দিয়ে একজন প্রাক্তন সামরিক স্বৈরশাসক, যৌনদানব, মাতাল, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অন্দরমহলের অবিশ্বাস্য সব জানালা খুলে দিয়েছেন। সাংবাদিক দেওয়ান বারীন্দ্রনাথ পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। ১৯৭১ এর যুদ্ধকালীন সময় এবং এর পূর্বে ইয়াহিয়া খানের ভূমিকা, তার অন্ধকার জীবনের নানাদিক বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে লেখক 'প্রাইভেট লাইফ অব ইয়াহিয়া খান' বইটিতে লিখেছেন।

ঐতিহ্য
ISBN 978-984-776-238-8

প্রাইভেট লাইফ অব ইয়াহিয়া খান

দেওয়ান বারীন্দ্রনাথ

অনুবাদ : রাফিক হারিরি

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪২২
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
একশত পঁচাত্তর টাকা

PRIVATE LIFE OF YAHIA KHAN by Dewan Barindranath
Translated by Rafik Hariri
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2016

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 175.00 US$ 5.00
ISBN 978-984-776-238-8

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

১.

শয়তানের নৃত্য

১৯৭১ এর ২৬ নভেম্বর, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিদেশি সাংবাদিকদেরকে প্রেসিডেন্ট ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন ভারতের সাথে একটা যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তার দুজন বিশ্বস্ত জেনারেল, জেনারেল গুল হাসান এবং জেনারেল পিরজাদা তার পাশেই বসে ছিলেন। নতুন দিল্লির অপরাধ আর অবৈধ কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ একটা ফিরিস্তি টেনে নাটকীয়ভাবে তিনি ঘোষণা করলেন– 'যথেষ্ট হয়েছে, এর একটা শেষ হওয়া উচিত, পাকিস্তান আর সহ্য করবে না। তাই আমি আপনাদেরকে ভারতের আগ্রাসনের বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়াটা পরিষ্কার করতে চাই। হয়তো দীর্ঘদিন আপনাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না, দিন দশেকের মধ্যে আমিও হয়তো সম্মুখযুদ্ধে নেমে পড়ব।'

ভারতের বিরুদ্ধে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধ ঘোষণায় বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে গেল।

পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো বড় বড় শিরোনামে তাদের প্রেসিডেন্টের ঘোষণা ছেপে দিল।

উদাহরণস্বরূপ লাহোরের মাশরিক পত্রিকার রিপোর্ট ছিল এই রকম:

'ভারতের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য', প্রেসিডেন্টের ঘোষণা;'দিন দশেকের মধ্যে আমি নিজেই সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেব'।

'ইন্ডিয়াকে ধ্বংস করো' এই জাতীয় স্টিকার হঠাৎ করেই প্রতিটি গাড়ি, হোটেল, স্কুল, হাসপাতাল এমনকি মসজিদের দেয়ালেও দেখা যাচ্ছিল।

ইয়াহিয়া খান নির্দেশ দিলেন এই জাতীয় স্টিকার উর্দু আর ইংরেজিতে লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়ে চারদিকে যেন বিলি করা হয়। টেলিভিশন স্টেশনগুলো পুরো পাকিস্তান জুড়ে দেশবাসীকে আসন্ন যুদ্ধের বিষয়ে সতর্ক করতে শুরু করল, যুদ্ধের সময় তারা যেন নিরাপদ স্থানে থাকে সে বিষয়ে বারবার ঘোষণা দিল। ইয়াহিয়া খানের জিনিয়াস সেনা অফিসাররা পত্রিকার সম্পাদকীয় আর

টিভি প্রোগ্রামগুলোর মূল সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করলেন। এই সব অনুষ্ঠানে ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধে জেনারেল ইয়াহিয়া খান একজন বীর ছিলেন– সেটাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। সিনেমা হলে আর টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের একদল চিত্রপরিচালকের তৈরি শর্ট মুভি দেখাতে শুরু করল যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্যই ১৯৬৫-এর পাকভারত যুদ্ধ, সেখানে কতটুকু বিনয় আর বীরত্বের সাথে তিনি ভারতীয়দের সাথে আচরণ করেছিলেন সেটাকে দারুণভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হলো। তবে জাং নামের একটা উর্দু দৈনিক পত্রিকা ব্যতিক্রম ছিল। তাদের এক রিপোর্টে বলা হলো যুদ্ধের এই সব ফিচার যা টিভি সিনেমাতে দেখানো হচ্ছে সেগুলো অতিরঞ্জন আর এগুলো তৈরি করা হয়েছে ১৯৬৫-এর যুদ্ধের ছয় বছর পর। পাক সেনাবাহিনীর সহায়তায় ও মঞ্চায়নে এই সব যুদ্ধের দৃশ্যায়ন করা হয়েছে।

মাওসেতুং এর প্রচারণার ধারণা থেকে চুরি করে পাকিস্তানি সরকারি প্রকাশনা সংস্থা লক্ষ লক্ষ কপি বুকলেট ছাপিয়ে মানুষের মাঝে বিলি করা শুরু করল। যার শিরোনাম ছিল 'ইয়াহিয়া খানের ভাবনা'। ছোট্ট এই বইটিতে ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিত্ব, তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সামরিক প্রতিভা সব কিছু নিয়ে অতিরঞ্জন আকারে প্রশংসা করা হলো।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা ১৯৭১-এর মার্চের ২৬ তারিখ জেনারেল ইয়াহিয়া খান যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের উপর তার বিষয়ে বিবৃতি দিলেন এই বলে যে, 'তিনি পাকিস্তানের রক্ষাকর্তা। দেশকে রক্ষা করায় জাতি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

ভারতের সাথে যুদ্ধের আগে সব কিছুই আবেগতাড়িত হয়ে এমনভাবে চলছিল যা সত্যিকার অর্থেই একটি অপরিহার্য যুদ্ধের আশু ইঙ্গিত দিচ্ছিল। অসংখ্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। অবশ্য এর কিছুকাল পরেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান যখন রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত হয়ে লাঞ্ছনার প্রতিশব্দে পাল্টে গেলেন তখন বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর বুদ্ধিজীবীরা কাদাছোড়াছুড়ি শুরু করলেন। একে অপরকে দোষ দেয়া শুরু করলেন।

যাই হোক এটা অন্য গল্প। পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলা হবে।

তবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান আসলে কী করেছিলেন? এই বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ইরানি সাংবাদিক আমির তাহিরি। তিনি সেই সময় ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণে ইসলামাবাদে অবস্থান করছিলেন।

কায়হান ইন্টারনেশনাল নামের তেহরানের একটি পত্রিকায় তাহিরি বলেন যে ইয়াহিয়া খান এই সময় শেখ মুজিবুর রহমানের ভূত দিয়ে আতংকগ্রস্ত ছিলেন। শুধু তাই নয় এই সময় তাকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধি, মি. জাগজিভান রাম এবং ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে জনাব ভুট্টোকে নিয়েও ভীতত্রস্ত দেখা গেছে।

আমির তাহিরির এই সব বিষয় নিয়ে ভালো জানার কথা। কারণ এই সময় প্রেসিডেন্ট হাউসের ভেতর কী ঘটছে সে বিষয়ে তার চতুর্ভুজ ধারণা ছিল। তিনি চারপাশ থেকেই সব কিছু দেখছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল গেস্ট হাউজের একদম পাশ ঘেঁষে থাকতেন সেই সময়। কায়হান ইন্টারন্যাশনালের ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখের সংখ্যায় আমির তাহিরি লিখেছিলেন যুদ্ধ চলাকালীন সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই বোতল মদ পান করতেন। তার স্নায়ুবিক উত্তেজনাকে রোধ করার জন্য তিনি এটা করতেন। ৭২ এর জানুয়ারি পর্যন্তও যেটা ঠিক হয়নি।

তাহিরির ভাষ্য মতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে চিৎকার করতেন, 'মুজিবকে এখান থেকে সরাও আর ওকে ফাঁসিতে ঝুলাও।'

শুধু তাই নয় জনাব ভুট্টো, মিসেস ইন্দিরা গান্ধি ও জাগজিভান রামকে নিয়ে তিনি সব সময় হেলুসিনেশনে ভুগতেন। তার মনে হতো এরা তাকে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে, তাকে খুন করতে আসছে। প্রায়ই একজন ডাক্তার এসে তাকে শান্ত হওয়ার ওষুধ দিয়ে যেতেন।

ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত যখন ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করছিল সেই সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান নভেম্বরে সম্মুখযুদ্ধে থাকার যে দম্ভভরে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার পরিবর্তে বেশির ভাগ সময় তার ঘরে নিদ্রা পোশাক পরে শুয়ে থাকতেন। এমনকি তার চিফ অব স্টাফদের সাথে তিনি দেখা করতেও আসতেন না। এমনকি ১৬ই ডিসেম্বরের আত্মসর্মপণের ঘোষণার জন্য তাকে জেনারেল গুল হাসান একরকম টেনে এনেছিলেন। কারণ সে সময় তিনি ভরপেট মদ খেয়ে পাঁর মাতাল। ফলে ঘোষণাটা পর্যন্ত দিতে দেরি হয়েছিল।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এক রকম কাল্পনিক ধারণা ছিল যে তিনি একজন তুখোর অভিনেতা আর তার ইংরেজি উচ্চারণ চমৎকার। যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে তিনি বাড়িতে নাটক আয়োজন করতেন। তার পছন্দের নাটক ছিল জুলিয়াস সিজার যেখানে তিনি মার্ক এন্টোনির ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

এই নাটকের মঞ্চায়ন অনুষ্ঠানে তার পছন্দের বান্ধবীরা আর পরিবারের ঘনিষ্ঠজনেরা উপস্থিত থাকত।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিন পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার এক অধীনস্ত জেনারেলের আমন্ত্রণে এক অনুষ্ঠানে যান। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল সে অনুষ্ঠান। দেশে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে সেরকম কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না সেই অনুষ্ঠানে। ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে তার মুখের জ্বলন্ত সিগারেট অনুষ্ঠানের সাজিয়ে রাখা বেলুনগুলোর মধ্যে চেপে ধরতে শুরু করলেন। সিগারেটের আগুনে একটা একটা বেলুন ফাটছিল আর ইয়াহিয়া খান খুশিতে চিৎকার করে উঠছিলেন এই বলে– 'জাগজিভ রাম ধ্বংস হলো', তারপর আরেকটা বেলুন ফাটিয়ে বললেন, 'এই তো ভুট্টো ধ্বংস হলো' এইভাবে একের পর এক বেলুন ধ্বংস করতে করতে শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এখন শেখ মুজিব ধ্বংস হলো।'

সিগারেট দিয়ে বেলুন ফাটানোর এই নাটক শেষ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেহমান পাকিস্তানের তৎকালীন বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম নুরজাহানকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে চলে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে পাঁচ ঘণ্টার মতো সেখানে থাকলেন। বাইরে অনুষ্ঠান চলছে আর ভেতরে তারা দুজন।

গায়িকা নুরজাহানকে পরবর্তীতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং ইয়াহিয়া খানকে সঙ্গ দেয়ার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি মিডিয়া নুরজাহানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। দীর্ঘদিন তার কোনো গান রেডিও কিংবা টেলিভিশনে প্রচারিত হয়নি। নুরজাহানকে নিয়ে আমরা এই বইয়ের অন্য অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পাকিস্তানি পত্রিকাগুলো এই খবর প্রকাশ করেছিল যে টিভিতে যখনই ইয়াহিয়া খান কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন তখন স্নায়ুবিক উত্তেজনার কারণে তার বারবার পানি খাওয়ার দৃশ্যটা দর্শকদের নজর এড়াতে পারেনি। সেই গ্লাসে অবশ্য স্বাভাবিক পানীয় ছিল না। সেখানে ছিল উত্তেজনা দূর করার পানীয়।

শুধু তাই নয় তিনি যখন ভুট্টোর কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখনো এতটাই মাতাল ছিলেন যে তার বক্তব্যের সারকথাটা তিনি ঠিক মতো বোঝাতে পারেননি। ভুট্টোর হাতেও তখন একটা শ্যামপেনের বোতল ছিল। তিনিও মাতাল ছিলেন। ফলে পাকিস্তানবাসীকে আত্মসমর্পণের ঘোষণাটা দিতে মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

যুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে লিখেছিলেন লাহোরের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পাঞ্জাব পাঞ্চ এর সাংবাদিক জাভেদ মাহমুদ। তিনি লিখেছেন :

'জেনারেল ইয়াহিয়া খান যদি তার অফিসারদের জন্য কঠোর হতেন তাহলে যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি শত্রুপক্ষের জন্য ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াতেন। আমাদের অনেকেই জানে না কেন হঠাৎ করে পুরো জাতি একটা নিদারুণ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গেল, জাতির ভাগ্য আকাশে কেন কালো মেঘ এসে জমা হলো, আমাদের পাকিস্তানি সৈন্যরা ভয়াবহ আগ্রাসনে মারা যেতে শুরু করল। কেন শত্রুর আঘাতে পাকিস্তানিদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়তে শুরু করল। আমরা এই সব কিছুই জানতে পারলাম না। বরং সেই সময় আমাদের জেনারেল ইয়াহিয়া খান পতিতাদের সাথে আনন্দে সময় কাটাতে ব্যস্ত, পার্টিতে সময় কাটাচ্ছেন, তার অফিসাররা নিজেদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সাথে আনন্দে সময় পার করছেন।

এটা অবশ্য এখনো জানা যায়নি যে কেন ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা থেকে ইসলামাবাদে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আর সিদ্ধান্তগুলো ঠিকমত পৌঁছায়নি।'

যাই হোক নানা রকম বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে এটা জানা যায় যে তখন জেনারেল উমর, জেনারেল গুল হাসানের মতো বড় বড় সামরিক কর্মকর্তার সূর্যাস্তের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করা বা যোগাযোগ করা অসম্ভব ছিল।

ডিসেম্বরের ১১ তারিখ ঢাকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিকের উপস্থিতিতে জেনারেল মানেকশর কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনার অনুমতির জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে জরুরি সংবাদ পাঠাতে জেনারেল নিয়াজিকে বলা হয়।

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানি সৈন্যরা যেন নিরাপদে তাদের দেশে ফিরতে পারে এই শর্তে আত্মসমর্পণের নীতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী চারদিন পাকিস্তানি সরকার কেমন হবে এই নিয়ে ইন্ডিয়া কিছুটা বিচলিত ছিল। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট হেডকোয়ার্টারে পাকিস্তানি গোয়েন্দাবাহিনীর কিছু রিপোর্ট এমন ছিল যে ইন্ডিয়া এই যুদ্ধটাকে আর লম্বা করতে চায় না। তারা নিজেদের কম রক্তপাত ঘটিয়ে এর সমাধান খুঁজছে। শুধু তাই নয় বঙ্গোপসাগরে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর নিয়েও ভারত কিছুটা বেকায়দায় ছিল। তারা দ্রুততম সময়ে দেশের অভ্যন্তরে কম রক্তপাত আর ধ্বংসযজ্ঞ না ঘটিয়ে দ্রুত একটা সমাধান খুঁজছিল। জেনারেল রাও ফরমান আলী আমেরিকান উচ্চপদস্থ

কূটনৈতিকদের মাধ্যমে সরাসরি নিউইয়র্কের সাথে যোগাযোগ করে আত্মসমর্পণের একটা সম্মানজনক পথ বের করেছিলেন। জেনারেল নিয়াজি অবশ্য কিছুটা বাদ সেধেছিলেন। কিন্তু সেদিন দুপুরেই কুষ্টিয়ার পতনের পর জেনারেল নিয়াজি দ্রুত যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আত্মসমর্পণের শর্তসহ সংবাদ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠান। তবে সেই সময় এই সংবাদ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো অসম্ভব ছিল। কারণ তিনি তখন নিজে মাত্রাতিরিক্ত ভোগ বিলাসে মত্ত ছিলেন। যে রানার তার কাছে এই খবর নিয়ে এসেছিল তিনি চিৎকার করে তার দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন। এমনকি ফোনে কথা বলতেও তিনি অস্বীকার করছিলেন। কারণ এই বিষয় নিয়ে ফোনে কথা বললে তার আনন্দটা মাটি হয়ে যেতে পারে। যাই হোক ইয়াহিয়া সেই সময় এতটাই মাতাল ছিলেন যে তার পক্ষে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারো সাথে কথা বলা সম্ভব ছিল না। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মতে অনুষ্ঠানটা ছিল মারাত্মক রকম উন্মত্ততা আর নগ্নতায় ভরপুর। উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তারা তাদের স্ত্রী আর মেয়েদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকলের পশ্চিমা ধাঁচের অর্ধ নগ্ন পোশাক ছিল। এমন সব কার্যকলাপ সেখানে চলছিল যা ছাপার অযোগ্য। এই সবের ভেতর দিয়েই সে রাতে পাকিস্তানের ভাগ্যকে সিলমোহর মারা হয়েছিল। শয়তানের এই নৃত্য আর উন্মাতাল ফূর্তির ভেতর দিয়ে রাতটা পার হয়। সেই রাতেই করাচির হারবারে আগুন ধরে, চাক লালা বিমানবন্দরে শত্রু পক্ষ তিনদফা বোমা বর্ষণ করে। এই সব নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। কারণ তাকে কালো সুন্দরী নামের এক জাদুকরী জ্যোতিষী নারী বলেছিল যে তিনি বছরের শেষ সময় তার সফলতা আর অর্জনের শেষ চূড়ায় উঠবেন। তার দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। শুধু তাই নয় তার চারপাশের মোসাহেব সেনা অফিসাররাও সব সময় তাকে বলতেন যে তিনি ক্রুসেডকালীন সময়ের মুসলিম বীর স্পেন বিজয়ী জেনারেল তারেকের মতো দারুণ প্রতিভাবান আর সাহসী একজন সেনা অফিসার।

সেই রাতের এবং সেই সময়ের একটি চিত্র বর্ণনা করে লি মন্ডে পত্রিকা বলছে যে পাকিস্তানির সেই ক্রান্তিকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে তার অফিসারদের যোগাযোগের সমস্যা। কেউ তার সাথে ঠিক মতো যোগাযোগ করতে পারতেন না। যত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হোক না কেন কারো পক্ষেই সকাল এগারোটার আগে কিংবা সন্ধ্যা ছয়টার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করা সম্ভব ছিল না।

ডিসেম্বরের সেই সময়গুলোর অবস্থার বিষয়ে একজন পাকিস্তানি দক্ষ সেনা কর্মকর্তা কর্নেল হায়দার হোসেন লাহোরের নাওয়ায়ে ওয়াক্ত পত্রিকায়

লিখেছেনঃ 'সেই সময় ইয়াহিয়া খানের কাছে কারো প্রবেশ ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি পর পর দুবার তার পিস্তল বের করে জেনারেল পিরজাদাকে গুলি করতে গিয়েছিলেন। কারণ পিরজাদা তাকে সম্মুখ যুদ্ধের বিষয়ে খারাপ সংবাদ শুনিয়েছিল। কারণ জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে বোঝানো হয়েছিল এই সব খারাপ সংবাদ শত্রু পক্ষ ইচ্ছে করেই তাকে বিব্রত করতে আর তার মানসিক দৃঢ়তাকে নষ্ট করার জন্য ছড়াচ্ছিল।'

এই রকম একটা সংবাদ চাউর ছিল যে আমেরিকার উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিক্সন চাচ্ছিলেন যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান যেন একটা মধ্যপন্থি কোনো আয়োজন করেন যাতে করে ভারত তার জড়িয়ে পড়া সংঘর্ষ থেকে বেশ ভালোভাবে বেড়িয়ে আসতে পারে আর কম রক্তক্ষয় হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সেই সময় এতটাই মাতাল ছিলেন যে তার সাথে ফোনে যখন আমেরিকার কূটনৈতিকরা কথা বলছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সাথে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে 'আত্মসমর্পণের আয়োজনের জন্য তোমাদের বেজন্মা অফিসারগুলোর আমার প্রয়োজন নেই।'

ঘটনা যাই হোক না কেন সেই সময়ের পরিস্থিতি ক্রমশই পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সৈন্য ও সেনা কর্মকর্তাদের জন্য হতাশাজনক ছিল। তারা যে কোনোভাবেই হোক একটা সম্মানজনক আত্মসমর্পণের সমাধান খুঁজছিল।

তবে এই গল্পের সবচেয়ে অবাক করা অংশ হলো ১৯৬৯ সনে পাকিস্তানি সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্বে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ছিলেন অত্যন্ত সুপরিচিত আর সুখ্যাতি সম্পন্ন সেনা কর্মকর্তা, একজন দক্ষ প্রশাসক, দয়ালু বাবা, বিশ্বস্ত স্বামী।

ইয়াহিয়া খানের এই উত্থান পতনের পেছনে ছিল একজন পৌরাণিক নেতা হওয়ার খায়েশ, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান আর লাম্পট্য।

গ্রন্থের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে কীভাবে একজন মানুষের এরকম পরিবর্তন ঘটল এবং একজন হিরোকে কোন চরিত্রগুলো মূলত একজন ভিলেনে পাল্টে দিল আমরা সেটা বের করার চেষ্টা করব।

২.
উত্থান আর পতন

পাঠান বংশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কাজিলবাশ পরিবারে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের জন্ম। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুই শাখায় তার পড়াশোনার রেকর্ড ছিল বেশ ভালো। কাজিলবাশ পাঠানরা সমাজে এমন একটা উচ্চ সম্ভ্রান্ত কমিউনিটি তৈরি করতে পেরেছিল যাদের সাথে আফগানিস্তানের পশতু ভাষার সুন্নি সম্প্রদায় ও বিরোধী শিয়া সম্প্রদায় উভয়ের সাথেই ভালো সম্পর্ক ছিল। কাজিলবাশদের জায়গা জমি ছিল না কিন্তু তারা পাঠান সমাজে বেশ ভালো অবস্থান তৈরি করেছিল।

ইয়াহিয়া খানের বাবা পাঞ্জাব পুলিশে কাজ করতেন। তিনি লাহোর, অমৃতসার, লালপুর ও আম্বালাতে পুলিশের দায়িত্ব পালন করেছেন । তার বাবা পুলিশে কাজ শুরু করেছিলেন একজন হেড কনস্টেবল হিসেবে আর পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

করাচির আখবারে জাহানের সম্পাদক পাকিস্তানির বিখ্যাত সাংবাদিক মাহমুদ শাম জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বাবার পুলিশে কাজ করার সময় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বের করে নিয়ে এসেছিলেন।

ঘটনা ছিল এই রকম যে ১৯৩১ এর ২৭ মার্চ লাহোর কারাগারে ব্রিটিশ সৈন্যরা শহীদ ভাগত সিং, রাজ গুরু, আর সুখ দেবকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা পুরো ঘটনাটা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করতে চেয়েছিল। সেই রাতেই তিন দেশপ্রেমিকের লাশ ফিরোজপুরে সুতলিজ নদীর তীরে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন ব্রিটিশ সেনা অফিসাররা। সেই সময় ইয়াহিয়া খানের বাবা পুলিশের সাব ইনসপেক্টার ছিলেন। এই কাজের জন্য তাকে ডাকা হলে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা আর গোপনীয়তার সাথে কাজটা সম্পন্ন করেন। তাকে পুরস্কার স্বরূপ সেই সময় খান সাহেব উপাধি দেয়া হয়। এবং একই সাথে তিনি পদোন্নতি লাভ করেন।

ইয়াহিয়া খান ছাত্র হিসেবে যতটুকু ভালো ছিলেন তার চেয়ে বেশি অধ্যবসায়ী আর পরিশ্রমী ছিলেন। পাকিস্তান অর্থমন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব মোহাম্মদ ইউনুস যিনি পাঠান বংশের ছিলেন এবং ইয়াহিয়া খানের সাথে ছাত্রজীবনে এক রুমেই ছিলেন তিনি ইয়াহিয়া খানের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য আমাকে দিয়েছেন।

ইউনুস সাহেবের মতে ইয়াহিয়া খান সাদামাটা ছাত্র ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখতে পছন্দ করতেন। ইউনুস সাহেবের নেতৃত্বে যতগুলো আন্দোলন হয়েছিল তার একটিতেও ইয়াহিয়া খান অংশগ্রহণ করেননি। তবে ব্যক্তিগতভাবে ইয়াহিয়া খান নিজের পড়াশোনার বিষয়ে অনেক পরিশ্রমী ছিলেন আর কমিশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করেছিলেন। সেই সময় মেয়েঘটিত কোনো অপকর্ম, মদ্য পান, সিগারেট খাওয়া অল্পবয়সের তরুণরা সাধারণত যা করে তার কোনোটার সাথেই ইয়াহিয়া খানের সম্পর্ক ছিল না।

১৯৩৯ সনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর ইয়াহিয়া খান ইন্ডিয়ান আর্মিতে কমিশনড অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান। তার শিক্ষাগত রেকর্ড খুব ভালো না হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেনাবাহিনীর পরীক্ষাগুলোতে বেশ ভালো নম্বর পেয়েছিলেন। সেই সময় সেনাবাহিনীতে খুব কম সংখ্যক পাঠান গ্রাজুয়েট অফিসার ছিলেন। অধিকাংশ অফিসারের গ্রাজুয়েশন ছিল না এবং তারা র‍্যাঙ্ক থেকে কমিশন লাভ করেছিলেন। ফলে উচ্চতর পড়াশোনা থাকার কারণে ইয়াহিয়া খান বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসারদের মাঝে।

দেশ ভাগের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান মিলিটারি হাইকমান্ডে নীল চোখের বালক হিসেবে কদর পেতে শুরু করেন। এই সময়ের ভেতর তিনি পর পর দুবার জেনারেল আইয়ুবের সাথে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৯-৫০ সনে তিনি জেনারেল আইয়ুবের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার্তদের সাহায্য প্রকল্পে দারুণ সফলতার সাথে কাজ করেন। একই সাথে ভারত পাকিস্তান সীমান্তে চোরাকারবারি ঠেকাতেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন।

জেনারেল আইয়ুবের বিশেষ নির্দেশে ১৯৫১ সনে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান আর্মিতে অল্প বয়সে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৫৭ সনের মধ্যে পর পর বেশ কয়েকটি পদোন্নতির কারণে তিনি দ্রুত চিফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে নিয়োগ পান। একই সাথে তিনি পাকিস্তানি আর্মির সব চেয়ে তরুণ মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৫৮ সনে মার্শাল ল জারি হওয়ার পর আইয়ুব খান যখন পরবর্তী এগারো বছরের জন্য পাকিস্তানি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন তখন থেকে ইয়াহিয়া খান খুব ভালো কিছু করতে পারেননি যা তার সুখ্যাতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে এই সময় ইয়াহিয়া খানের সবচেয়ে অর্জন ছিল ইসলামাবাদকে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার প্রকল্পে সফলতা। হুবহু চণ্ডিগড় শহরের মতো গড়ে তোলা পাকিস্তানের রাজধানীর সিংহ ভাগ কৃতিত্বটুকু চলে যায় ইয়াহিয়া খানের ঝুড়িতে।

একজন ভারতীয় কূটনীতিক যিনি সেই সময় পাকিস্তানের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন তার মতে পণ্ডিত নেহরু যখন চণ্ডিগড় শহরের উন্নতি চাকচিক্য নিয়ে কথা বলতেন তখন সেটা ইয়াহিয়া খানের পছন্দ হতো না। তিনি নেহরুকে হিংসা করতেন।এমনকি এই বিষয় কথা উঠলে তিনি মাঝে মধ্যে নিজের উত্তাপ ধরে রাখতে পারতেন না। একদিন ইয়াহিয়া খান রাগ করে বলেই ফেললেন যে দুই বছরের মধ্যে চণ্ডিগড়ের চেয়ে আরো উন্নত আর সুন্দর একটা রাজধানী তিনি তৈরি করবেন।

রাজধানী তৈরির সমস্ত পরিকল্পনা আগে থেকেই তৈরি ছিল। এর পর এই প্রকল্পের প্রধান প্রশাসক হিসেবে যখন ইয়াহিয়া খানকে নির্বাচিত করা হলো তখন তিনি পুনরায় নিজের সুখ্যাতি নিয়ে আবির্ভূত হলেন। অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন করেন।

ইয়াহিয়া খানের হাত দিয়ে সেই সময় কোটি কোটি টাকার প্রকল্প আর চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই সময় তার বিরুদ্ধে একটি টাকা চুরির কিংবা অন্য কোনোধরনের দুর্নীতির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি ইসলামাবাদকে রাজধানী করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিলেন। তার সাথে যারা কাজ করেছিল তাদের প্রত্যেককেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি সূর্য ওঠার সাথে সাথেই নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যেতেন আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত কাজের তদারকি করতেন যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সমস্ত কার্যক্রম যেন শেষ হয়।

এই সময় ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে তেমন কলংকজন কিংবা আলোচনার মতো কিছু শোনা যায়নি। শুধু তাই নয় আইয়ুব খানের শাসন যখন ক্রমশ অসহনীয় আর নানা রকমের সমালোচনায় ভরে উঠছিল একই

সাথে আইয়ুব খানের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের নামও উঠে আসছিল সেই সময়ও ইয়াহিয়া খানের বিষয়ে তেমন কোনো দুর্নামের খবর পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের সমাজে কেউ মিশলেই বুঝতে পারত এই সমস্ত সামরিক কর্মর্কতাদের প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক বিয়ের সাথে জড়িত ছিলেন। আর সেই বিয়ের সময়কালও ছিল খুব কম– দুই থেকে চার বছরের মধ্যে ।

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিকের জরিপে দেখা যায় যে ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানি জেনারেলদের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল বৈবাহিক ক্ষেত্রে।

পাকিস্তানি আর্মির দুই ডজনেরও বেশি সেনাকর্মকর্তার এই ধরনের কুখ্যাতি ছিল। এদের মধ্যে ষোলোজন বিয়ে করেছিলেন দুইবার আর ছয়জন বিয়ে করেছিলেন পাঁচবারের বেশি। অবশ্য এই সময় চিফ অব কমান্ড আইয়ুব খান এই ধরনের বদনাম থেকে দূরে ছিলেন। শুধু তাই না আরো গুটিকতক সেনা অফিসারদের মধ্যে এই সময় ইয়াহিয়া খান আর টিক্কা খানও ছিলেন। তারা সেই সময় অবশ্য তত বড় সেনা অফিসার হয়ে উঠেননি।

পাকিস্তানের একজন সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে সেই সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সামরিক অফিসারদের ক্লাব বারে রাত আটটার পরে দেখা যেত না। আটটা পর্যন্ত তিনি হয়তো অন্য অফিসারদের সাথে টুকটাক পান করতেন। তারপর আটটা বাজলেই পরিবারের লোকজনের সাথে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য চলে যেতেন। তার স্ত্রী যে তার মায়ের দিক থেকে খালাতো বোন ছিল তিনিও কখনো সেই সময় ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। অন্য সেনা অফিসারদের যেমন অন্য অফিসারদের স্ত্রীদের প্রতি আসক্তিজনিত বদনাম বা অভিযোগ থাকে সেই রকম কোনো অভিযোগ তিনি ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে কখনো করেননি।

একজন আমেরিকান পর্যবেক্ষক-লেখক পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তাদের বিষয়ে গবেষণামূলক একটা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তাদের বদনামের সময়গুলোতে ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া গিয়েছিল অত্যন্ত আদর্শবাদী একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে। তিনি নিজের দায়িত্বে অত্যন্ত মনোযোগী আর কাজ অন্তপ্রাণ ছিলেন। একজন মুসলিম সেনাকর্মকর্তা হিসেবে যেমনটা ভাবা হতো তিনি ছিলেন তার সমার্থক। রোজার মাসে তিনি রোজা থাকতেন, সারা মাস সব ধরনের পানীয় থেকে দূরে থাকতেন।

এমনকি ১৯৬৩ সনে ইসলামাবাদে একটি জনসভায় আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন তোমরা আমাকে ইয়াহিয়া খানের মতো নৈতিকতায় আর কর্মদক্ষতায়

পূর্ণ বারোজন সেনাকর্মকর্তা দাও আমি তোমাদের জন্য পাকিস্তানকে ইসলামিক বিশ্বে একটা আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে তৈরি করে দেব।

ভারতের সাথে পাকিস্তানের ১৯৬৫ এর যুদ্ধের ভেতর দিয়ে ইয়াহিয়া খান তার জীবনের সেরা সফলতাটুকু অর্জন করেন। এই যুদ্ধের বীরত্বের কারণে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে প্রশংসা কুড়ান। এক অনুষ্ঠানে আইয়ুব খান তখন ইয়াহিয়া খানকে হিলালে জুরাত (ক্রিসেন্ট অব ভেলর) উপাধি দেন। এই উপাধিটি তখন হাতে গোনা অল্প কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে দেয়া হয়েছিল।

অবশ্য পাকিস্তানের সাথে ভারতের এই যুদ্ধের সময়ই ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়া খানের এক ধরনের হিসেব নিকেশ শুরু হয়। ভুট্টো তখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক সব কিছু দেখা শোনা করতেন। এই সময়ই ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের কমান্ডার ইন চিফ মনোনীত হন। ভুট্টো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইস্তফা দেন। তিনি তখন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় নেতা। জনরোষ ফুঁসে উঠছিল তখন আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে। এই রকম পরিস্থিতিরে আইয়ুব খান তার কমান্ডার ইন চিফ ইয়াহিয়া খানের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের কট্টর সমালোচক এয়ার মার্শাল আসগর খান লাহোরের মাশরিক পত্রিকায় ইয়াহিয়া খানের সমালোচনা করে বলেন যে ১৯৬৯ এর সময় পাকিস্তানে যখন তীব্র জনরোষ আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তখন ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন।

একটা প্রসিদ্ধ গল্প চালু আছে যে ১৯৬৮ এর প্রথম দিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোকে বলেছিলেন যে তার নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনী জনতার সমস্যা সমাধানে এবং তাদেরকে একটা গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করতে পূর্ণ প্রস্তুত। সাধারণ জনতার নেতারা অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতারা যদি জনতাকে নিয়ে সেরকম কোনো পরিস্থিতি কিংবা মঞ্চ তৈরি করতে পারেন তাহলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাদেরকে আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত।

এই কথা বলে ইয়াহিয়া খান অবশ্য ভুট্টোকে একটা প্রচ্ছন্ন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভুট্টো সেটা গ্রহণ করেননি। কারণ তার মতে এই রকম কোনো গণঅভ্যুত্থানের জন্য সেই সময়টা পরিপক্ব হয়নি।

সে যাই হোক আমরা এখন জানার চেষ্টা করি কেন ইয়াহিয়া খানের মতো একজন পরিচ্ছন্ন ইমেজের মানুষ হঠাৎ করে মদ আর নারীর জন্য মধ্য যুগীয় দানব হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানি লেখক সাংবাদিক গবেষকদের কাছে বিষয়টা সত্যিকার অর্থেই কৌতূহলী ছিল। তারা এটা নিয়ে মানুষের চরিত্রের নানা

দিকের বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে যারা পাকিস্তানের বাইরে ছিলেন তাদের কাছে অবশ্য এর কোনো যৌক্তিক কিংবা সমাপ্তিসূচক কোনো উত্তর ছিল না।

মর্নিং নিউজের সম্পাদক জেড এ সুলুরি যার একই সাথে আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের সাথে সুসম্পর্ক ছিল এবং যিনি ইয়াহিয়া খানের পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় এক সাংবাদিকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে ইয়াহিয়া খানের শাসনামলের প্রথম ছয় মাস তিনি একদম পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তার চরিত্রের রেকর্ড প্রথমদিকের মতোই অটুট ছিল। তবে পরিস্থিতি যত ঘোলাটে হতে শুরু করে এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে শুরু করে তখন রাজনৈতিক বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার দুর্বলতা, অদূরদর্শিতা সার্বিকভাবে এক জটিল পরিস্থিতিতে খুব স্বাভাবিক গতিতে মদ আর নারী তার চরিত্রে ঢুকে যেতে শুরু করে। তিনি এতেই জটিল সময়গুলোতে আস্থা পেতে শুরু করেন। মদ আর নারী সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করা শুরু করে।

আমাকে পাকিস্তানের একজন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে তিনি আমাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি ইয়াহিয়া খানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইয়াহিয়া খান যখন কমান্ডার ইন চিফ অব দ্য আর্মি ছিলেন তখনও তিনি তার সাথে কাজ করেছেন। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এই সেনাকর্মকর্তার ছিল। আমাকে তথ্যদাতা এই সেনাকর্মকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক আর কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি জীবনে মদ পান করেননি এমনকি কখনো সিগারেট খাননি। ইয়াহিয়া খানের নৈতিক পরিবর্তনের কারণ কী এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ইয়াহিয়া খানের পতনের পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিক একটি চক্র কাজ করেছিল।

আমার এই ধার্মিক সেনা অফিসার বলেন যে ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন তখন থেকেই একদল সুযোগ সন্ধানী লোক ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে। একই সাথে ভারতীয় ও রাশিয়ান চক্রও ইয়াহিয়া খানের বুদ্ধিগত বিষয়টাকে পরাস্ত করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

আমার এই সোর্স আরো বলেন যে ইয়াহিয়া খানের চারপাশে যে সব নারীরা ছিল তাদের অধিকাংশকেই ভারতীয় চক্র নিয়োগ দিয়েছিল। তিনি

অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে এই নারীদের কাউকে কাউকে ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কোম্পানিতে চাকরি করতে দেখা গেছে।

আমি তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ বিষয়টা জানার পরেও কেন সেটা ইয়াহিয়া খানের গোচরে আনেনি?

উত্তরে তিনি বলেন যে আল্লাহ যখন কাউকে ধ্বংস করতে চান তখন তাকে অন্ধ করে দেন।

পাকিস্তানের দুই তরুণ সাংবাদিক ইশতিয়াক আহমেদ ও শাহিদ সুলেমান বলেন যে ১৯৭০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান তার পূর্বের চরিত্রের মতোই সৎ ছিলেন। কিন্তু '৭০ এর নির্বাচনের পর সব কিছু পাল্টে গেল। ইয়াহিয়া খানের আর্মি ইন্টিলিজেন্স গ্রুপ তাকে নির্বাচনের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ দিতে ব্যর্থ হয়। তাদের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমে ভুট্টো ও পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান আশানুরূপ তেমন কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু নির্বাচনের পর তার হিসেব হলো উল্টো। এই নির্বাচনের কারণে ইয়াহিয়া খানের একনায়ক হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। এই রকম উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে নিজের হতাশা থেকে বের হয়ে আসার জন্য তিনি মদ পানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সুযোগবুঝে এই সময় সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সেনাকর্মকর্তারা তাদের স্ত্রী বান্ধবী কন্যাদেরকে নিয়ে ইয়াহিয়া খানের চারপাশে ভিড় করতে থাকেন। ইয়াহিয়া খান সেই সুযোগটা গ্রহণ করেন।

শাসকগোষ্ঠীর পরিবারের খুব কাছাকাছি আরেকজন মহিলা সাংবাদিক বলেন যে ১৯৭১ এর শুরুর দিকে বেগম ইয়াহিয়ার সাথে ইয়াহিয়া খানের সম্পর্কটা একদম স্বাদহীন আন্তরিকতাশূন্য হয়ে পড়ে। বেগম ইয়াহিয়া অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর মধ্যবয়স্ক ইয়াহিয়া খানের শারীরিক চাহিদার ঠিক মতো সাড়া তিনি দিতে পারছিলেন না বলে ইয়াহিয়া খানের মধ্যেও একরকম হতাশা আর বিরক্তি চলে আসে। ফলে ইয়াহিয়া খানের মতো একটা শক্ত চরিত্র যখন একবার বিগড়ে যায় তখন আর ফিরে আসার সুযোগ থাকে না।

ইয়াহিয়া খানের হারেমখানার আরেক নারী ইয়াহিয়া খান যাকে জেনারেল রানি হিসেবে ডাকতেন এই গ্রন্থের পরবর্তী বিশাল অংশ জুড়ে তার আলোচনা থাকবে এই মহিলা ইয়াহিয়া খানের পদস্খলনের অন্য আরেকটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। সে সব সময় ইয়াহিয়া খানের পক্ষে কথা বলেছে। তার মতে ইয়াহিয়া খান খুব খারাপ মানুষ ছিলেন না। নিজের শাসনামলের শেষ দিকে তার চরিত্রের অধঃপতন হয় মূলত মিসেস কে এম হুসাইনের কালো জাদুর

কারণে। মিসেস কে এম হুসাইন ইয়াহিয়া খানের হারেমখানায় কালো সুন্দরী নামে পরিচিত ছিলেন। জেনারেল রানির মতে কালো সুন্দরী ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার মেয়ে। সে বাংলাদেশ থেকে কালো জাদু শিখে ইয়াহিয়া খানের প্রেসিডেন্সি হাউসে এসেছিল। পাকিস্তানের শক্ররা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য কালো সুন্দরীকে নিয়োগ দিয়েছিল।

সমস্ত ব্যাখ্যার আড়ালে ইয়াহিয়া খান ছিলেন একজন ট্রাজিক হিরো। আধুনিক যুগের কিং লিয়ার যিনি নিজের রাজনৈতিক অদক্ষতা, নারী আর মদের লোভের কারণে একই সাথে ভিলেনও ছিলেন। তিনি শুধু নিজের ধ্বংসই নয় বরং একই সাথে পাকিস্তানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

তার সেই ধ্বংসের কাহিনি এক এক করে চলুন দেখা যাক।

৩.
প্রেসিডেন্সিয়াল হারেম

ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ১১ দিন পর ১৯৭২ এর জানুয়ারির ১ তারিখ লাহোর টেলিভিশন নতুন বছরের জন্য একটা ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা করল।

প্রথমবারের মতো তারা জনতার সামনে এমন কতগুলো সুন্দরী রমণীর ছবি প্রচার করা শুরু করল যাদের সাথে ইয়াহিয়া খানের গভীর সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের কারণে হতাশ পাকিস্তানিরা টেলিভিশনে ইয়াহিয়া খানের গোপন এই কুৎসিত চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের বিরোধিতা করল। কারণ গোঁড়া মুসলিম পরিবারগুলোতে যেখানে পরিবারের সবাই এক সাথে বসে টিভি অনুষ্ঠান দেখে সেখানে এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার দর্শকদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। আবার কেউ কেউ এটা বলতে শুরু করল যে পাকিস্তানের শত্রুরা এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ষড়যন্ত্র করছে। কারণ তারা এর মাধ্যমে পাকিস্তানের পরাজয়ের পেছনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নৈতিক স্খলনকে মূল কারণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে।

তবে এই ধরনের অভিযোগ প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। তিনি বরং নির্দেশ দিলেন ইয়াহিয়া খানের হারেম জীবনের সব কিছু খুঁটিনাটি যেন সাধারণ মানুষকে দেখানো হয়। সাধারণ মানুষের জানা উচিত কেন এবং কীভাবে তারা যুদ্ধে হেরেছিল। কিছু মানুষ বিশেষ করে জামাতে ইসলামি ভুট্টোর এই ধরনের কাজের তীব্র সমালোচনা করল। তারা বলল যে ভুট্টো নিজের ইমেজকে আরো স্বচ্ছ ও জোরালো করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা করছে।

ঘটনা যাই হোক না কেন ভুট্টো নিজেই টেলিভিশন মিডিয়াকে উৎসাহিত করেছিলেন গত ১১ মাসে সেনাবাহিনীর ভিতর যা ঘটেছিল তার সব কিছুই

পাকিস্তানি সমাজের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে যেন প্রকাশ করে পৌছে দেয়া হয়।

প্রথমবারের মতো ইয়াহিয়া খানের হারেমের 'অন্তর্বাস দলের' চারজন সুন্দরী নারীর ছবি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হলো। তবে এই চারজন রমণীর ভাগ্যে যে পরিণাম এসেছিল পরবর্তীতে আরো যাদের ছবি প্রকাশ করা হলো যেমন চিত্রনায়িকা তারানা, কালো সুন্দরী, ম্যাডাম নুরজাহান, মিস দুরানি ও কোমল এদের ভাগ্যে তেমন খারাপ পরিণতি ডেকে আনল না। পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমের দীর্ঘদিনের একটা তর্ক ছিল এমন যে কেন এই মহিলাদের নাম পাকিস্তানি মিডিয়াতে সর্বপ্রথম আসেনি এবং কেনই বা তাদের নিয়ে খুব হইহুল্লোড় হয়নি।

ইয়াহিয়া খানের হারেম জীবনে যে সমস্ত নারীর প্রভাব প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল সম্ভবত তাদেরকে সর্বপ্রথম টেলিভিশনে প্রচার করতে লাহোর টেলিভিশনের কাছে কোনো অফিসিয়াল নির্দেশনা ছিল।

এই ধরনের নারীদের মধ্যে একজন ছিল শরিফান। সে ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিজীবনের সাথে জড়িত হওয়ার আগেই লাহোরে দেহব্যবসায় অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল।

সৈনিকদের একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে শরিফান নাচতে আর গান করতে আসলে সেখানে তার সাথে ইয়াহিয়া খানের পরিচয় হয়। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার দুদিন পর ইয়াহিয়া খান তাকে করাচি গর্ভনমেন্ট হাউসে দেখা করতে বলেন। একই সাথে শরিফানের ব্যবসায়িক কার্যালয় লাহোর থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন।

শুধু তাই নয় ইয়াহিয়া খানের সাথে শরিফানের গভীর সম্পর্কের কারণে সে একটা উপাধি পেল। পদোন্নতি প্রত্যাশী সেনা অফিসার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকজন নিজেদের উন্নয়নের জন্য শরিফানকে ডাকত প্রপার চ্যানেল বলে। কারো কোনো ধারণাই ছিল না কীভাবে শরিফান তাদের বস্ ইয়াহিয়া খানকে নিয়ন্ত্রণ করে সবধরনের আবদার আদায় করে নিত।

তবে করাচিতে উচ্চবিত্ত সমাজে এমন একটা গল্প প্রচলিত ছিল যে শরিফান তার ক্রেতাদের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের সুবিধা আদায়ের জন্য যেমন কোনো লাইসেন্স বা পদোন্নতির তদবিরের নির্দিষ্ট হারে উপঢৌকন গ্রহণ করত। এই ধরনের কাজে শরিফানের পারিশ্রমিক ছিল পঞ্চাশ হাজার রুপি থেকে শুরু করে এক লাক রুপি।

কিছু কিছু পাকিস্তানি সংবাদপত্র যেমন মুসাওয়াত, যেটা সে সময় পাকিস্তানি পিপলস পার্টির মুখপাত্র ছিল, তারা এমন রিপোর্ট প্রকাশ করে যে ইয়াহিয়া খান

নির্দিষ্ট হারে শরিফানের এই ধরনের উৎকোচের উপর ভাগ বসাতেন। শরিফানকে তার আরো দুই ভাতিজা এই কাজে সাহায্য করত।

ইয়াহিয়া খানের লাম্পট্যের বিষয় নিয়ে নানা রকম গাল গল্প থাকলেও সম্পদ আহরণের প্রতি তার অন্ধ ভালোবাসা ও আসক্তির বিষয়ে তেমন কোনো গল্প প্রচলিত ছিল না। সুইস ব্যাংকে তার কোটি কোটি রুপি অবৈধভাবে জমা থাকার প্রমাণের পরেও সম্পদ আহরণে তার দুর্নীতির বিষয়ে খুব একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি।

তার সম্পদ আহরণের ও লাম্পট্য জীবনের আরেক কুখ্যাত চরিত্র ছিল পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রী নুর বেগম। পাকিস্তানি উচ্চবিত্ত সমাজে যে চাচি নামে পরিচিত ছিল।

নুর বেগম একই সাথে ইয়াহিয়া খানের অন্দরমহলের সহযোগী হিসেবে শরিফানের সাথে কাজ করত এবং পদোন্নয়ন, লাইসেন্স দেয়া বিভিন্ন ধরনের সরকারি অনুমতি বিষয়ক তদবিরের কাজও সে করত। তবে তার মূল দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন টিভি মিডিয়ায় সংবাদ পাঠিকা আর উপস্থাপিকাদের উপর নজর রাখা। তাদের মধ্য থেকে আকর্ষণীয় উপস্থাপিকাদেরকে সে ইয়াহিয়া খানের অন্দরমহলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করত।

সেই সময় করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি শহরগুলোয় চটুল কথাবার্তা জারি ছিল এই উপস্থাপিকাদেরকে নিয়ে। বাবা-মারা খুব অনিচ্ছায় তার সুন্দরী মেয়েদেরকে টিভি উপস্থাপিকা হিসেবে পাঠাত। এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল যে কোনো সুন্দরী উপস্থাপিকার কাছে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে ফোন আসার পর সেই মেয়ের বিষয়ে টিভি স্টুডিওতে আর কোনো খবর পাওয়া যেত না।

ইয়াহিয়া খানের নারী সঙ্গীদের মধ্যে তৃতীয় যে নারীকে নিয়ে লাহোর টেলিভিশন মাতামাতি করছিল তার নাম হলো ফেরদৌসি। এই নামে অবশ্য একজন পাকিস্তানি অভিনেত্রী আছে। তবে সে আর এই নারী ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র।

ফেরদৌসি তার অন্য দুজন সহকর্মীর মতো কাজ করত না। তার মূল দায়িত্ব ছিল প্রেসিডেন্টকে দিয়ে যে সব উত্তপ্ত উন্মাতাল অনুষ্ঠান হতো সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করা।

শুধু তাই নয় ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ এর মার্চ মাসে যখন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় যায় শেখ মুজিবের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করতে তখনো ফেরদৌসিকে সাথে নিয়ে যান।

পাকিস্তানি সাংবাদিকদের মতে ফেরদৌসি ছিল অত্যন্ত ধুরন্ধর আর নীতিভ্রষ্টা ডাইনি। তাকে বিদেশি শক্তিগুলো গোপনে নিয়োগ দিয়েছিল যাতে করে সে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ইয়াহিয়া খান আর পূর্ব বাংলার শেখ

মুজিবের সাথে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যেখান থেকে ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ সহজে বের হয়ে আসতে পারবেন না।

ফেরদৌসিকে নিয়ে আরো বড় রহস্যময় ষড়যন্ত্র হলো তাকে নিয়ে লাহোর টেলিভিশন যখন খুব মাতামাতি করছে আর সে সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ঠিক তার দুই মাসের মধ্যেই ভোজভাজির মতো তাকে নিয়ে সমস্ত কানাঘুষা বাতাসে মিলিয়ে গেল।

১৯৭১ এর মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সিয়াল হারেমে ইয়াহিয়া খানের আনন্দময় জীবনের আরো দুজন নারী চরিত্র ছিল। রানি আর নুরজাহান। তবে ফেরদৌসির প্রভাবের কারণে তাদের নাম খুব ভালোভাবে উঠে আসতে পারেনি।

ফেরদৌসিকে নিয়ে আরেকটা ব্যাখ্যা এমন ছিল যে ইয়াহিয়া খানের পতনের পর ভুট্টোর আমলের সরকারের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সেই সরকারের অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। ফেরদৌসিকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে তাদের চরিত্রের অন্ধকার দিকও বের হয়ে আসবে– এই ভয়ে সরকারের উর্ধ্বমহল থেকে লাহোর টেলিভিশনকে চাপ দেয়া হয় যাতে করে ফেরদৌসিকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করা না হয়। মনে করা হয় এই গোপন নির্দেশের কারণেই ফেরদৌসিকে নিয়ে সব ধরনের আওয়াজ হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়।

লাহোর টেলিভিশন চতুর্থ যে নারীটির কথা প্রচার করেছিল সে হলো কাউসার। তার বয়স তুলনামূলক কম ছিল। সে করাচি টিভি স্টেশনে ঘোষক হিসেবে কাজ করত। তার অনিন্দ রূপ সৌন্দর্যের জন্য প্রেসিডেন্ট তাকে খুব পছন্দ করতেন।

প্রায় সময়ই করাচি গর্ভনমেন্ট হাউসে তাকে নিমন্ত্রণ করা হতো। ইয়াহিয়া খান নিজ হাতে তাকে অনেক দামি নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে ১৯৭১ এর অক্টোবরে ইয়াহিয়া খান পর পর দুই রাত্রি কাউসারকে নিয়ে কারারানের একটি উপকূলীয় বিনোদন হাউসে কাটিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খানের নাম জড়িয়ে আরো একটা মজার সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে লাহোরের নৃত্য শিল্প গোষ্ঠী ও সংগীত শিল্পী গোষ্ঠী পৃথিবী সুপরিচিত পেশা সংগীত ও নৃত্যকে নিয়ে ইয়াহিয়া খানের মতো একজন দুশ্চরিত্রবানের সাথে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা এ জন্য সংবাদ মাধ্যমকেও দোষারোপ করছে এবং নিন্দা জানাচ্ছে।

বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়ের মূল কারণ হিসেবে যেহেতু সংবাদ মাধ্যমগুলো ঢালাওভাবে নৃত্য শিল্পী আর দেহব্যবসায়ী রমণীদেরকে ইয়াহিয়া খানের সাথে জড়িত করে দায়ী করা হচ্ছিল তাই নৃত্য শিল্পী গোষ্ঠীর সেই প্রতিবাদ ও ব্যাখ্যায় লাহোরের প্রভাবশালী দেহব্যবসায়ী ইনায়েত বেগম বলে যে ইয়াহিয়া খানের চরিত্র স্খলনের মূল কারণ হিসেবে কেবল মোটা দাগে আমাদেরকেই দায়ী করা হয়। অথচ তার পতনের মূলে আমরা নই বরং তার পতনের মূলে ছিল উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও তাদের সুন্দরী কন্যারা– যারা সব সময় ইয়াহিয়া খানকে মনোরঞ্জন করে বেড়াত।

তাদের এই প্রতিবাদ কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে উর্দু পত্রিকা হুররিয়াত ১৯৭১ এর ২৪ মার্চ সংখ্যায় উল্লেখ করে যে আমাদের এই পতনের জন্য গুটিকতক দেহব্যবসায়ী নারীকে জড়িয়ে ইয়াহিয়া খানের চরিত্রের যেই চিত্র ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সেটা সত্যিকার অর্থেই বোকামি। আমাদের এই পতনের অন্যতম অংশীদার পত্রিকা মাধ্যম যারা এই কাজটা তিনমাস আগে থেকে শুরু করলে আমরা অনেক লাভবান হতাম। আমাদের পতনের জন্য মূল দায়ী এই তথাকথিত নারীরা নয় বরং আমাদের শাসন ব্যবস্থাই দায়ী।

দেশের পতনের জন্য ইয়াহিয়া খান নিশ্চিতভাবেই দায়ী এবং তার ব্যক্তি জীবনের পতন কোনোভাবে এড়ানো যাবে না। তার আশপাশে যে নারী আর পুরুষেরা ছিল তারাও প্রত্যেকেই উন্মাদ আর চরিত্রহীন লোভী লম্পট ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে তাদের নিয়ে আমরা যত কম কথা বলব তত আমাদের উপকার। আমাদের সকলের জন্য সেটা মঙ্গল বয়ে আনবে।

আমাদেরকে এটা ভুললে চলবে না যে আমরাই এই শাসক আর তার চারপাশের মানুষগুলোকে নির্বাচিত করেছি আমাদের দেশটাকে শাসন আর ধ্বংস করার জন্য । এখন আমাদের উচিত আমাদের তিক্ত অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এই শপথ নেয়া যে আমরা ভবিষ্যতে আর এই ধরনের কাজ কিছুতেই হতে দেব না।

বাস্তব দিক থেকে ইয়াহিয়া খানের বিষয়ে অনেক যুক্তিপূর্ণ তথ্য থাকলেও অনেকে অবশ্য তার এই সমস্ত লাম্পট্য বিষয়ের ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করেছেন। তবে ইয়াহিয়া খানের বিশ্বস্ত একজন সেনা কর্মকর্তা ইয়াহিয়া খানের বিষয়ে সত্য ভাষণ দিয়েছে। তার নাম হলো জেনারেল রানি। সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাবি করেছে যে ইয়াহিয়া খানের হারেমখানায় শরিফান ও নুর বেগম

ছিল অত্যন্ত কাছের মানুষ। তারা ইয়াহিয়া খানের বিনোদনের বিষয়ে সব আয়োজন করত। শুধু তাই নয় এই দুজন নারী ইয়াহিয়া খানের ঘরের কাজের বিষয়েও দেখাশোনা করত এমনকি তারা প্রমোশনের বিষয়ে তদবির করার মূল চ্যানেল ছিল। তবে ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিজীবনে টিভি মিডিয়া যেভাবে বলছে এই চার নারীই কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল না। বরং তাদের সাথে আরো উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তার স্ত্রীরা এবং সমাজের উচ্চ স্তরের নারীরা ছিল, তাদের ক্ষমতা ও দাপট এতটাই বেশি ছিল যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মিডিয়া কথা বলার সাহস করেনি।

নারী বিষয়ক ইয়াহিয়া খানের আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা ছিল ১৯৭১ এর যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে নারী বিষয়ক জটিলতায় তিনি একবার কমান্ড হামলার শিকার হন এবং কাকতালীয়ভাবে সে আক্রমণ থেকে বেঁচে যান।

করাচির জঙ্গ নামের একটি পত্রিকা ১৯৭২ এর মার্চ সংখ্যায় এই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন পেশ করে। সেখানে তারা উল্লেখ করে যে এটা পাকিস্তানের জন্য দুর্ভাগ্য ছিল যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ড আক্রমণে ইয়াহিয়া খান বেঁচে গিয়েছিলেন।

করাচি রেডিওর ধারাভাষ্যকার জনৈক অল্প বয়সী সুন্দরী তরুণীর প্রেমে ইয়াহিয়া খান একবার উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সময়টা ছিল ১৯৭১ এর শেষের দিকে। সেই সুন্দরীর মূল দেশ ছিল বাংলাদেশে। কিন্তু তার বাবা মা কাজ করত করাচিতে। করাচির উচ্চবিত্ত সমাজে তাদের বেশ ভালো প্রভাব ছিল। ঘটনাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু স্বাধীনতাকামী যুবকের সাথে তার বেশ সখ্যতা ছিল। তরুণদের এই দলটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরে একটা কমান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল।

তরুণদের এই দলটির প্রধান ছিল জাফর ইকবাল নামের এক যুবক। সে পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ছেলে ছিল। কাকতালীয়ভাবে সেই সময় করাচি রেডিওর সুন্দরী ধারাভাষ্যকারের সাথে তার পরিচয় হয়। সেই সুন্দরী তখন বেশ কয়েকবার গভর্নমেন্ট হাউসে যাতায়াত করেছিল।

সুন্দরী ধারাভাষ্যকার তখন ইয়াহিয়া খানকে গোপনে ছদ্মবেশে অন্য এক গোপন জায়গায় দেখা করার অনুমতি চাইল। ইয়াহিয়া খান রাজি হয়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। এই ধরনের গোপন অভিসারে ছদ্মবেশে ইয়াহিয়া খান আরো বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন তার অন্যান্য বারবনিতাদের সাথে। ঠিক হলো রাত সাড়ে এগারোটায় তাদের দেখা হবে।

জাফর ইকবাল ও তার দুই বন্ধু মিলে ইয়াহিয়া খানের জন্য অপেক্ষারত তার বান্ধবীর নির্দিষ্ট ফ্লাটে গোপনে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় সেই সুন্দরী ধারাভাষ্যকারের আরেক ধনবান বন্ধু ঘরের দরজায় এসে শব্দ করে। সেই লোক আগেও বেশ কয়েকবার সুন্দরী বান্ধবীকে তার সাথে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল। তো সেই লোক ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই লুকিয়ে থাকা তিন বাংলাদেশি মুক্তি ফৌজ অন্ধকারের মধ্যেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। যুদ্ধের সময় করাচিতে প্রায় সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ থাকত না। পুরো করাচি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত। একটু পরই যুবতির ঘরে ফোন আসে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে। তাকে বলা হয় বিশেষ সমস্যার কারণে ইয়াহিয়া খান আজকের প্রোগ্রাম বাতিল করেছেন।

করাচি পুলিশ তিন যুবককে গ্রেফতার করে এবং পুরো বিষয়টা গোপনীয়তার সাথে মিটমাট করে ফেলে।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আমি যতদূর শুনেছি (লেখক) জাফর ইকবাল ও তার ধারাভাষ্যকার বান্ধবী ও তার অন্য বন্ধুরা কারাগারেই বন্দী ছিল।

এটা সত্যিই বেশ অবাক করা বিষয় যে ভুট্টো যে তিনজন যুবক পাকিস্তানের স্বৈরশাসককে হত্যা করে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য ঘোচাতে চেয়েছিল সেই যুবকদেরকে মুক্তি দেয়াটা উপযুক্ত মনে করেননি। এর পরে অবশ্য তাদের বিষয়ে আর কিছু শোনা যায়নি। তাদেরকে কি বাংলাদেশে পুনর্বাসিত করা হয়েছে নাকি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে আর কিছুই জানা যায়নি।

৪.
হারেম কেবিনেট

বহু বছর পাকিস্তানি উচ্চবিত্ত সমাজে পঁয়তাল্লিশ বছরের তারানা মুখরোচক গল্প হিসেবে সবার মুখে মুখে ছিল। ভারত ভাগের পূর্বে যারা বোম্বের ফিল্মের খোঁজখবর রাখতেন তারা এই উন্মাতাল, আত্মবিশ্বাসী তরুণী অভিনেত্রীকে খুব ভালো করেই চিনে থাকবেন। তারানা বোম্বের অসংখ্য ছবির পার্শ্ব চরিত্রে সাহসী অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করেছে। তার খোলামেলা অভিনয়ের জন্য সে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। এমনকি সেই সময় তার উঠতি খোলামেলা সংকোচবিহীন অভিনয়ের জন্য তারানার পরিচয় সবার মুখে মুখে ছিল।

আগ্রার সংগীত আর নৃত্য পরিবার থেকে আসা তারানা প্রযোজকদের মনোরঞ্জনের জন্য পর্দার ভেতরে ও বাইরে সব জায়গায় যে কোনো ধরনের অভিনয় করতে সংকোচ করত না। তবে এটা ছিল শুরুর দিকের ঘটনা। সেই সময় বোম্বে ছবির জগতে তার পরিচয় ছিল অত্যন্ত সীমিত।

তার পরিবার যখন পাকিস্তানে এসে বসবাস শুরু করল তখন তারানার ভাগ্যের পরিবর্তন শুরু হলো। পাকিস্তানে এসেও তার খোলামেলা অভিনয় বন্ধ হলো না। তবে কিছু দিনের মাঝেই সে বুঝতে পারল ছবির নায়িকা হিসেবে তার এই আচরণ দিয়ে সে পাকিস্তানে টিকতে পারবে না। এর পর থেকে সে ছবির চরিত্রগুলো খুব সাবধানে নির্বাচন করে অভিনয় করা শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সাথে তার পরিচয়ের পরই নিজের সাথে নিজের এই বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ এর শুরুর দিকে একটা টিভি অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া খান সর্বপ্রথম তাকে চিহ্নিত করেন।

ইয়াহিয়া খান সেই সময় নিজেকে শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাকে প্রায় সময়ই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে দেখা যেত। জেনারেল রানির মতে এক অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া খানের সাথে তারানাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় দেশের বাইরে কার্যরত জনৈক পাকিস্তানি দূতের কন্যা হিসেবে। প্রথম

দেখাতেই ইয়াহিয়া খান মুগ্ধ হয়ে যান। তারানাকে করাচির গভর্নমেন্ট হাউসে নিমন্ত্রণ করেন। তারানার তখন চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তারপরেও তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন ইয়াহিয়া খান। শুধু তাই নয় পাকিস্তানি দূতের কন্যা হিসেবে পরিচিত হওয়ার মিথ্যে উসিলাটুকু পরে প্রকাশ পেলেও ইয়াহিয়া খান সেটা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। তাদের মধ্যে সম্পর্কের কোনো ফাটল ধরেনি। এক সময় ভাগ্য তাদেরকে পৃথক করে দেয়।

জেনারেল রানি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তারানাকে নানা ধরনের অবৈধ কাজের জন্য দায়ী করেছিল। তার মতে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা তারানাকে ইয়াহিয়া খানের কাছে পরিকল্পিতভাবে পাঠিয়েছিল। তারানার মাধ্যমে তারা অনেক ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করত। এক সংবাদ সম্মেলনে তারানা দাবি করেছিল যে প্রেসিডেন্টের সাথে তার যে সম্পর্ক সেটা শুধু মাত্র একজন শিল্পীর সাথে আরেকজন শিল্প প্রেমীর সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট শিল্প সংস্কৃতি ও এর সাথে জড়িত লোকজনদের খুব পছন্দ করেন।

তারানা উল্টো দাবি কর যে জেনারেল রানি তাকে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করার জন্য চাপ দিত, ব্ল্যাক মেইল করত।

জেনারেল রানি আর ইয়াহিয়া খানের কাছের বডিগার্ডদের নিয়ে তারানার বিতর্ক দীর্ঘদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখরোচক সংবাদ হিসেবে প্রচার হচ্ছিল।

ইয়াহিয়া খান আর তারানাকে নিয়ে আরো একটি গল্প প্রচলিত ছিল। প্রথমবার যখন তারানাকে করাচির গভর্নমেন্ট হাউসে নিমন্ত্রণ জানানো হলো তখন সে সন্ধের দিকে নির্দিষ্ট সময় তার স্পোর্টস গাড়িটা নিয়ে হাজির হলো। কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজি হলো না। কারণ এই সময় প্রায় সকলের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। ইয়াহিয়া খান এই সময় তার প্রিয় ব্ল্যাক ডগ স্কচ হুইস্কি নিয়ে বসেন। তারানা খুব দৃঢ়ভাবে তার নিমন্ত্রণের কথা বললে গার্ড তখন এডিসির সাথে যোগাযোগ করে বসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাকে ভেতরে যেতে দেয়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা প্রেসিডেন্টের সাথে তারানার বৈঠকের পর সে যখন বের হয়ে আসে তখন যাওয়ার সময় তারানা গার্ডকে বলে তুমি বোকা গার্ড আমাকে এখানে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলে, আমার সাথে শক্ত ব্যবহার করেছিলে, আমার সাথে যে আচরণ করেছিলে তার পরিণাম কী হতে পারে জান?

গার্ডস খুব নরমভাবেই উত্তরে বলেছিল, 'আপনি যখন এখানে এসেছিলেন তখন একজন সাধারণ তারানা ছিলেন, কিন্তু এখন যখন বের হচ্ছেন তখন আপনি কাওমি তারানা, আমাদের জাতীয় তারানা। আপনাকে স্যালুট।'

আমি যখন (লেখক) সর্বশেষ পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আর লাহোর ঘুরে আসলাম তখন ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে এই জাতীয় আরো অসংখ্য মজার মজার ঘটনা শুনেছিলাম।

তারানা দীর্ঘদিন সংবাদ মাধ্যমের উত্তপ্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। শুধু তাই নয় তারানা ছিল ইয়াহিয়া খানের হাতে গোনা কয়েকজন নারী বান্ধবীদের একজন যাদের সাথে ইয়াহিয়া খান দীর্ঘ সময় সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

করাচির একজন সাংবাদিক বলেন যে তারানার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল খুব মজার মজার বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা। এটা দিয়েই সে প্রেসিডেন্টকে মুগ্ধ করে রাখত। ইয়াহিয়া খান প্রয়োজন হলেই তারানাকে ডাকতেন। সেটা যত রাতই হোক না কেন।

পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমে আরেকটা প্রসিদ্ধ গল্প প্রচলিত ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় শেষের দিকে ইয়াহিয়া খান খুব অস্থির বোধ করতেন। নানা ধরনের কাজের জন্য তাকে সব সময় অস্থির থাকতে হতো। এই অস্থির সময়ে তিনি একদিন গায়িকা নুরজাহানকে ডাকলেন গান গেয়ে তার অস্থিরতা দূর করার জন্য । কিন্তু কিছুক্ষণ নুরজাহানের গান শুনেই ইয়াহিয়া খান বিরক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সাথে সাথেই নুরজাহানকে গাট্টি বোচকা গুটিয়ে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তার একটু পরে ডাক পড়ল তারানার। ইয়াহিয়া খান এরপর তারানার সাথে পুরো রাত কাটিয়ে দিলেন।

নুরজাহান অবশ্য এই ঘটনাকে অস্বীকার করেছিল। সে যুক্তি দিয়েছিল যে সেই সময় সে ইসলামাবাদেই ছিল না। এই ঘটনা সত্য মিথ্যে যাই হোক না কেন এমন সাদৃশ্যপূর্ণ আরো অসংখ্য ঘটনা প্রেসিডেন্টের লাম্পট্য ও অতিমাত্রায় নারীকাতরতার বিষয়টাকেই প্রমাণ করে।

ঘটনা যাই হোক না কেন তারানার সাথে ইয়াহিয়া খানের সম্পর্কের প্রথম চার মাস তারানাকে নিয়ে তেমন কোনো সংবাদ প্রচারিত হয়নি। তবে তারানা সর্বপ্রথম আলোচনায় আসে মার্কেটে ডায়মন্ড কেনার ঘটনার ভেতর দিয়ে। তারানা এক ব্যস্ত মার্কেটে তার গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে এক জুয়েলারি দোকানে ঢুকে ডায়মন্ডের একটা নেকলেস সে পছন্দ করে। তারপর কোনো রকম মূল্য না চুকিয়েই তড়িঘড়ি করে দোকান থেকে বের হয়ে আসে। নিজের গাড়িতে উঠে সে গাড়িটা ১০০ কিমি গতিতে ছাড়ে। এই সময় তার গাড়ির ধাক্কায় একজন পথচারী আহত হয়। তার পা ভেঙে যায়। তাকে গ্রেফতার করা হলে কোর্টে তার আইনজীবীরা ম্যাজিস্ট্রেটকে এটা বুঝাতে সক্ষম হয় যে তারানা সেই ডায়মন্ডটা চুরি করেনি। আর রাস্তায় এত ভিড় ছিল যে ব্যস্ত আর

অমনোযোগী পথিক যাচ্ছেতাই অবস্থায় তার গাড়ির উপর এসে হামলে পড়ে। এখানে তারানার কোনো দোষ ছিল না। কোর্ট থেকে সে হাল্কা কিছু মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল।

তবে তারানাকে নিয়ে সবচেয়ে বড় কলংকজনক ঘটনা ঘটে ১৯৭৩ এর এপ্রিল মাসে। তার এই ঘটনার সাথে শুধু মাত্র বড় বড় ব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতিকরাই জড়িত ছিল না বরং একই সাথে অনেক বিখ্যাত পরিবারের মেয়েরাও জড়িয়ে পড়েছিল।

তারানার নামে অভিযোগ ছিল যে সে অভিজাত পরিবারের মেয়েদেরকে দিয়ে লাহোর, মুরি, করাচি, ইসলামাবাদে অভিজাত বেশ্যালয় খুলেছে। সেখানে সমাজের অতি ভিআইপি আর কোটিপতিদের যাতায়াত ছিল।

লাহোরের একজন ব্যবসায়ী তারানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পর ঘটনাটা আরো বিস্তর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ব্যবসায়ীর দাবি তারানা ফুঁসলিয়ে তার স্ত্রীকে বেশ্যালয়ে ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয় এই কাজে সে তার ভাই সাজ্জাদ পাশা, তার ষাট বছর বয়সের মাকে সাথে নিয়ে সমাজের আরো অনেক অভিজাত পরিবারের মেয়েদেরকেও বিভ্রান্ত করছে। পত্রিকাওয়ালারা এই সুযোগে তাদের পাঠকদেরকে আবারো মনে করিয়ে দিল যে এই তারানা ছিল ইয়াহিয়া খানের সাপ্লাই মন্ত্রী, তার সহযোগী ছিল আরেক লম্পট চরিত্র জেনারেল রানি যাকে বলা হতো এই কাজের প্রধানমন্ত্রী এবং আরেক নারী গায়িকা নুরজাহান, সংবাদ মাধ্যম তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ইয়াহিয়া খানের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী বলে।

তারানা প্রায়ই ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া খানের রাজত্বকালে ঘনঘন প্রেসিডেন্সি হাউসে যেত। সে বহু সংখ্যক সুন্দরী মেয়েকে প্রেসিডেন্টের সেবায় পাঠাত। এই জন্য সংবাদ মাধ্যম তাকে মিনিস্টার অব সাপ্লাই নামে ডাকত।

পুলিশের তদন্তে বের হয়ে আসে যে তারানা ইয়াহিয়া খানের পতনের পর পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে দেহব্যবসা শুরু করে। অত্যন্ত অভিজাত আর সুরক্ষিত পতিতালয়গুলো ছিল তারানার। যে পতিতালয়গুলো এক সময় সামরিক ও সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল তা এখন সাধারণ মানুষদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। অবশ্য প্রতি রাতের জন্য তাদেরকে ১০০০ থেকে ৫০০০ রুপি খরচ করতে হতো।

তারানার পতিতালয়ে এমন সব অভিজাত মেয়েরা থাকত যে তাদের কারণে তারানার সবগুলো গেস্ট হাউজ প্রতি রাতেই পূর্ণ থাকত।

পুলিশের তদন্তে [illegible] বে[illegible] [illegible] এসেছিল যে তারা[illegible] পতিতালয়গুলোতে পাকিস্তানের [illegible] [illegible]তর [illegible] [illegible]দেরকেও পাওয়া

পুলিশের এই তদন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দাবি উঠল যেন তারানার বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে সেটা জনগণের সামনে প্রকাশ করা হোক। কিন্তু পরবর্তীতে তারানার হস্তক্ষেপে পাকিস্তানের দুর্নীতিবাজ প্রশাসন এবং তারানার অনুরোধে খুব উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তার কারণে পুলিশই পুরো বিষয়টাকে ধামাচাপা দিয়ে দেয়।

সংবাদপত্র ইয়াহিয়ার হারেমখানার আরেকজন সুন্দরীর কথা উল্লেখ করেছে। সে হলো কোমল। ইয়াহিয়া খানের হারেমখানার সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। কোমল অবশ্য শক্তভাবে পত্রপত্রিকার এই দাবিকে অস্বীকার করেছে। প্রত্যুত্তরে সে বলেছে তাকে নিয়ে যা বলা হচ্ছে এই সব কিছুই গুজব। পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক শত্রুরা পাকিস্তানের অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের চরিত্র কলুষিত করার জন্য তাকে জড়িয়ে এই সব সংবাদ প্রকাশ করছে। সে আরো দাবি করে যে ইয়াহিয়া খানের সাথে তার মাত্র এক থেকে দুইবার সাক্ষাৎ হয়েছিল জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে।

ইয়াহিয়া খানের ঘনিষ্ঠ সহচর যে ইয়াহিয়া খানের এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখা শোনা করত সে দাবি করে যে এই কোমল ইয়াহিয়া খানের হারেমখানার খুব শক্তিশালী একজন সদস্য ছিল। সে ব্ল্যাক বিউটির সাথেই কাজ করত। ব্ল্যাক বিউটি আর কোমলের ষড়যন্ত্রের কারণে জেনারেল রানিকে ইয়াহিয়া খানের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

ইয়াহিয়া খানের প্রেসিডেন্সিয়াল হারেমখানার নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে নুরজাহান, তারানা, ব্ল্যাক বিউটি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুপরিচিতির কারণে সংবাদ মাধ্যমগুলোর খুব দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে অবশিষ্ট নারী চরিত্রগুলো অনেক বেশি মূল্যের বিনিময়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে নিরাপত্তা পেয়েছিল। পাকিস্তানে অনেক বিদেশি সাংবাদিক নূর বেগম আর শরিফানের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, ইয়াহিয়া খানের হারেম শরিফে তার অবস্থা কেমন ছিল এই সমস্ত বিষয় জানার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। শুধু তাই নয় তারা কোমাল ও কাওসারের মতো আরো অনেক সুন্দরীর বিষয়েও অনেক আগ্রহী ছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি আর সংবাদ মাধ্যমের কারণে অল্প কিছু নারী চরিত্র অধিক আলোতে পড়েছিল আর বাকিরা পিছলিয়ে বেঁচে গিয়েছিল।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল ইয়াহিয়া খানের লাম্পট্য আর দুর্নীতি নিয়ে সংসদে, মিডিয়ায়, সংবাদ মাধ্যমে এমনকি কোর্টেও আলোচনা করার কিছুদিন

পর দু-একটা রায় হয়ে গেলে পুলিশ প্রশাসন সমস্ত বিষয়টাকে ধামাচাপা দিয়ে দিল।

শুধু তাই নয় জাতীয় সম্মেলনে স্বয়ং সরকারের বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ উঠল যে তারা বিশাল অংকের টাকার বিনিময়ে ইয়াহিয়া খানের সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জামাতে ইসলামি পাকিস্তান ও জামাতে ওলামা সংসদে দাবি করল যে ইয়াহিয়া খানের উন্মাদ সময়গুলোতে যে সমস্ত নারী চরিত্রগুলো তাদের নারী মাংসের বিনিময়ে ব্যবসা করেছিল আর ইয়াহিয়া খানকে বিপদগামী করেছিল তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

যাই হোক এই ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া হারেমবাসীদের নেটওয়ার্ক ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ফলে যে কোনো ধরনের তদন্তই খুব অল্প দিনে মাঠে মারা গিয়েছিল।

কারো কারো মতে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা থেকে সরে গেলেও তার বন্ধু ও শুভার্থীরা ছিল তার অত্যন্ত অনুগত। পরবর্তীতে তারা ইয়াহিয়া খানের রক্ষার বিষয়ে সমস্ত কলকাঠি নেড়েছিল।

ইয়াহিয়া খানের লাম্পট্য জীবনের এই সমস্ত ঘটনা প্রথম প্রথম সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর কেনই বা আবার চুপসে গেল, সমাজে এর প্রভাব কী ছিল এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমার (লেখক) এক জার্মান সাংবাদিক বন্ধুর সাথে একবার কথা বলেছিলাম। তার মতে ইয়াহিয়া খানের পর বর্তমান ভুট্টো সরকার ইচ্ছে করেই বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। তার মতে ভুট্টো সরকার চাইছিল না প্রাক্তন সরকারের কোনো গোপন খবর প্রকাশের সাথে সাথে নিজেদের কোনো থলের বেড়াল যেন বের হয়ে না যায়। কারণ ভুট্টো সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী জনাব মমতাজ আলী ভুট্টোর বিষয়েও শত শত গল্প প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথেও মমতাজ আলী ভুট্টোর গভীর সম্পর্ক ছিল। ইয়াহিয়া খানের হারেমখানায়ও তার যাতায়াত ছিল।

এ ছাড়া পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ মির রাসুল বাকস তালপুরেরও অনেক লাম্পট্যের পূর্ণ ঘটনা ছিল। তিনি ১৯৭২ সনে অবসরে যান।

এ ছাড়া পাঞ্জাব গভর্নর জি এম খায়ের যিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন এবং পরিচিত ছিল মেট্রিক ফেইলোর নামে তার সাথে এমন অসংখ্য ঘটনা জড়িত ছিল। জি এম খায়ের ছিলেন ভুট্টোর প্রবলেম শুটার, এমনকি ইয়াহিয়া খানের সময়ও ভুট্টোর সাথে তার সম্পর্ক ছিল একই সাথে তিনি ইয়াহিয়া খানেরও প্রবলেম শুটার হিসেবে কাজ করতেন।

শুধু তাই নয় ১৯৭১ সনে মার্চ মাসে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বর্জন করার আগে জি এম খায়েরকে ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। খায়ের নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণির পাঞ্জাবি বক্তা আর কৌশলী রাজনীতিক ছিলেন। তবে একই সাথে তার লাম্পট্যপূর্ণ জীবনেরও অন্ত ছিল না।

১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সপ্তম বারের মতো বিয়ে করেন।

করাচির হুররিয়াত পত্রিকা বলে যে খায়ের লাহোরের একজন ডেন্টিস্টের সেক্রেটারি মিস শাহেরজাদকে বিয়ে করেছিলেন। জি এম খায়ের প্রায়ই সেখানে যেতেন।

তার বিয়েতে জনাব ভুট্টো ও ভুট্টোর স্ত্রী এবং সরকারের খুব নির্দিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানি পত্রিকাগুলো প্রায় সময় জি এম খায়েরর বিয়ের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কে মেতে উঠত।

তার সপ্তম বিয়ে নিয়ে লাহোরের নাবাই ওয়াক্ত পত্রিকা লিখেছিল আমাদের রাজনিতিক জি এম খায়ের বিয়ের বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করবে।

পাকিস্তানের সংবাদপত্রের ধারণা অনুযায়ী ইয়াহিয়া খানের প্রাক্তন সহকারী যারা পরবর্তীতে ভুট্টো সরকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তাদের প্রচেষ্টায় ভুট্টো সরকার দেশের প্রাক্তন সরকার প্রধানের বিষয়গুলো নিয়ে বেশি পরিমাণ হইচই করা থেকে বিরত ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের সুন্দরী রমণীদের মধ্যে যে নারীটা সবচেয়ে বেশি অগোচরে ছিল এবং সংবাদপত্র যাকে নিয়ে খুব একটা নাড়াচড়া করেনি সে হলো ফিরদৌসি। সে একজন নৃত্য শিল্পী ও অভিনেত্রী ছিল। ফেরদৌসি নামে অবশ্য ইয়াহিয়া খানের আরো একজন দেহপসারিণী ছিল। যাই হোক এই নৃত্য শিল্পী ফেরদৌসি দাবি করে যে ইয়াহিয়া খান তাকে শারীরিকভাবে ভোগের জন্য কখনো ব্যবহার করেননি। বরং মানসিক প্রশান্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে তার সাথে সময় কাটাতেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্র অবশ্য দাবি করত যে ফেরদৌসি লিখতে ও পড়তে জানত না।

বত্রিশ বছর বয়সী ফেরদৌসি ছিল ইয়াহিয়া খানের হারেম কেবিনেটের সবচেয়ে কম বয়স্ক সুন্দরী। ইয়াহিয়া খানের হারেমে আরো ছিল পাকিস্তান ব্যাংকের প্রধান পরিচালক জনাব দুররানির স্ত্রী, অফিসিয়াল সিআইডি প্রধানের স্ত্রী মিসেস এম এ খান।

ইয়াহিয়া খানের প্রাক্তন এই সমস্ত সহচারী সংঘবদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ইয়াহিয়া খানের সব বিষয় ধামাচাপা দিয়েছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

৫.
নারী মাংসের প্রতি লোভ

১৯৭২ এর জানুয়ারির ৫ তারিখ করাচির বাম ঘরানার আল ফাতেহ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কালো সুন্দরী' শিরোনামে একটি স্টোরি করে একদম প্রথম পাতায়। আল ফাতেহ পত্রিকা তাকে বলেছে ইয়াহিয়া খানের চারপাশের ডাইনি প্রতিভা। এই পত্রিকার মাধ্যমেই পাকিস্তানের লোকজন সর্বপ্রথম কালো সুন্দরী নামের এই পতিতা চরিত্র নামের মেয়েটির বিষয়ে জানতে পারে। ব্ল্যাক বিউটি বা কালো সুন্দরীর নাম এই গ্রন্থের পূববর্তী অধ্যায়গুলোতেও বেশ কয়েকবার এসেছে। এই কালো সুন্দরীর নাম ছিল মিসেস শামিম কে হুসাইন। পত্রিকায় তার নাম আসার আগেই মোটামুটি তার কানাঘুষা সব জায়গায় শোনা যাচ্ছিল। তবে আল ফাতেহ পত্রিকার উস্কানির মাধ্যমে এই কালো সুন্দরী দীর্ঘদিন পত্রিকাওয়ালাদের কৌতূহল আর রসালো আলাপের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

ব্ল্যাক বিউটির অবাক করা সব গল্প লিখতে গিয়ে আল ফাতেহ পত্রিকা উল্লেখ করে যে, 'ইয়াহিয়া খানের সাথে জড়িত অন্ধকারাচ্ছন্ন সমস্ত কাজগুলোর মধ্যে কালো সুন্দরীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রকট ও ঘৃণ্য । পূর্ব পাকিস্তানের একজন পুলিশ অফিসারের স্ত্রী ছিল সে। ইয়াহিয়া খানের সাথে শুধু মাত্র যৌন কলংকারিই নয় বরং একই সাথে সে আরো নানাবিধ দুর্নীতি ও কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। পাকিস্তান পতনের শেষ দিন পর্যন্ত পররাষ্ট্র বিষয়ক অফিসগুলোতে তার অবাধ বিচরণ ছিল। উর্ধ্বতন পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকর্তাদের বদলি, তাদের স্বার্থ রক্ষা, কূটনৈতিকদের আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা নানাবিধ বিষয়ে সে সরাসরি জড়িত থাকত। যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত যত রাত হোক না কেন ইয়াহিয়া খানের অন্দরমহলে তার প্রবেশাধিকার ছিল। সে অনায়াসে ঢুকে যেত ইয়াহিয়া খানের কাছে। নিজের স্বার্থ চিন্তা করে সে অনেক কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত পাল্টে দিত।

'এই রমণীটি যাকে কেবল মনে করা হতো একজন সাধারণ গৃহিণী, যে ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু করতে পারত না এবং বাচ্চাদের লালন পালনই শুধু করত সে– শুধুমাত্র ইয়াহিয়া খানের প্রধান নারীই হয়ে উঠল না বরং পাকিস্তানের জটিল সময়ের অংশ হয়ে উঠল। শুধু তাই নয় তাকে মনে করা হতো পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক রানি। এই রকম একজন নারী যখন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রধান হর্তাকর্তা হয়ে উঠে তখন বুঝতে হবে যে আমরা পাকিস্তানিরা ইতোপূর্বে যা করেছি সব ভুল করেছি।'

নাবায়ে ওয়াক্ত নামের আরেকটি বিরোধী পত্রিকা কালো সুন্দরীর নামে আরো কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছিল। পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে 'পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক পুরো বিষয়টাকে কালো সুন্দরী একটি অর্থনৈতিক বিষয়ে দাঁড় করেছিল। পররাষ্ট্র বিষয়ে যে কোনো ধরনের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সে নিয়ন্ত্রণ করত। এই বিষয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে সে টাকা লেনদেন করত।'

কালো সুন্দরীর নামে এই সমস্ত তথ্য বাজারে চালু থাকলেও বিরোধী দল সেনাবাহিনীর মাফিয়া চক্র ও সেনাশাসনের ভয়ে চুপ থাকত।

ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সনে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে যখন ঢাকায় যান তখনো ব্ল্যাক বিউটি নামটি একবারেই অপরিচিত ছিল। বিষয়টা সত্যিকার অর্থেই কিছুটা অবাক করা যে পাঁচ সন্তানের মা যার দুজন কিশোরী আর একজন একুশ বছর বয়সের যুবক ছেলে– এমন একজন নারীর প্রতি ইয়াহিয়া খান কেন আগ্রহী হলেন। ঢাকায় এসে ইয়াহিয়া খান কালো সুন্দরীর স্বামী জনাব কে এম হুসাইনকে নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে মনোনীত করেন। সেনাবাহিনীর কিছু বিশ্বস্ত তথ্য মতে ইয়াহিয়া খান কালো সুন্দরীর প্রতি যত না আকৃষ্ট ছিলেন তার চেয়ে বেশি তার স্বামী কে এম হুসাইনকে বিশ্বাস করতেন। মিডিয়া যেভাবে কালো সুন্দরীকে ইয়াহিয়া খানের সাথে জড়িত করে বর্ণনা করেছে আসলে বিষয়টা মোটেও সেরকম নয়। ইয়াহিয়া খান কালো সুন্দরীর প্রতি শারীরিকভাবে তেমন দুর্বল ছিলেন না। যেমনটা বলা হয় কালো সুন্দরী দেখতে তত আকর্ষণীয় কিংবা সুন্দরী ছিল না। ইয়াহিয়া খানের চারপাশে তখন যত সুন্দরী মেয়েরা ছিল তাদেরকে ফেলে কালো সুন্দরীকে নিয়ে ইয়াহিয়া খান ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তেমন আকর্ষণীয়া ছিল না কালো সুন্দরী।

সংবাদ মাধ্যম যেভাবে ইয়াহিয়া খানকে চিত্রায়িত করতে চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি কিছু ব্যতিক্রম আর জটিল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ইয়াহিয়া খান। নারী মাংসের প্রতি তার লোভ আর পানীয়ের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল

অটুট। একই সাথে শিল্প সাহিত্য নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার প্রতিও তার মনোযোগ ছিল। সেই আলোচনাটা কোনো আকর্ষণীয় নারীর সাথে হলে সেটা ছিল আরো বেশি উপভোগ্য । এটা সত্য ইয়াহিয়া খান যখন যেই নারীর সাথে পরিচিত হয়েছেন তাকেই বিছানায় নিয়ে গিয়েছেন। একই সাথে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলায় যারা বোদ্ধা তাদের প্রতিও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন। কালো সুন্দরী মিসেস কে এম হুসাইন ছিল জ্ঞানী পণ্ডিত মহিলা। শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারত। শেক্সপিয়ার, বায়রনের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল তার। এই দুইজন কবি আবার জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রিয় কবি ছিলেন। ফলে কালো সুন্দরীর সাথে মদ পানের আবেশে তিনি এই সব আলোচনাকে খুব উপভোগ করতেন। কালো সুন্দরীর প্রতি তার দুর্বলতার এটাও একটা বিশাল কারণ হতে পারে।

আরেকটা কারণ হতে পারে কালো সুন্দরী ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বংশোদ্ভূত। ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে খুব বিশ্বাসযোগ্য কাউকে খোঁজ করছিলেন। কারণ ইয়াহিয়া সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে বাঙালিরা তাকে হত্যা করবে। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের প্রতি অনুগত এমন একজন বাঙালি দেশপ্রেমিককে খোঁজ করছিলেন যে সব সময় তাকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে সতর্ক রাখতে পারবে এবং আওয়ামী লীগের বিপজ্জনক কার্যক্রম থেকে তাকে আগাম বার্তা দিতে পারবে। তার এই দুর্বলতা পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত আওয়ামী বিরোধী মানুষগুলোর প্রতিই ছিল। ব্ল্যাক বিউটি সে রকম একজন মহিলা ছিল যাকে বিশ্বাস করা যায়। কালো সুন্দরী আর তার স্বামী কে এম হুসাইন ছিল সেই রকম অল্প কতক বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানি যাদের উপর ইয়াহিয়া খান পূর্ণ আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। ইয়াহিয়া খানের হারেমখানায় কালো সুন্দরীর দুর্দান্ত প্রতাপের এটাও একটা বিশাল কারণ ছিল।

ইয়াহিয়া খানের বিষয়ে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম আরো কিছু বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল। ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত কিছু সহকর্মী যাদের সাথে আমার পরিচিতি ছিল তাদের কাছ থেকে আমি নতুন কিছু বিষয় জানতে পেরেছিলাম। ইয়াহিয়া খান তার বন্ধু মহল ও তার অধীনস্ত উর্ধ্বতন সহকর্মীদের সব সময় বলতেন যে একমাত্র কালো সুন্দরীর পরিবারের সাথেই তার পারিবারিকভাবে ভালো সম্পর্ক ছিল। এমনকি ইয়াহিয়া খানের ছেলের সাথে কালো সুন্দরীর সন্তানদেরও সব সময় যোগাযোগ থাকত। কালো সুন্দরীর সন্তানদের ইয়াহিয়া খান বেশ স্নেহের চোখে দেখতেন।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ক্রাইসিসের সময় যখন বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার নিয়েছিল তখন কালো সুন্দরীর মেয়ে তার

জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপহারস্বরূপ বিদেশি বাদক দলের উপস্থিতি চেয়েছিল। ইয়াহিয়া খান নিজের তত্ত্বাবধানে কয়েক লাখ টাকা খরচ করে পশ্চিম জার্মানি থেকে বাদকদল হাজির করেছিলেন।

'পপ মিউজিকের প্রতি ভালোবাসা' কালো সুন্দরীর সাথে ইয়াহিয়া খানের সুসম্পর্কের আরেকটা কারণ ছিল। তারা উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেন। ইয়াহিয়া খান উভয় পরিবারের সন্তানদের আয়োজনে রাওয়ালপিন্ডির ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে মিউজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন। সেখানে নিজে তার ছেলেমেয়ে আর ব্ল্যাক বিউটির ছেলেমেয়ের সাথে নাচ গান করতেন।

প্রচুর টাকা খরচ করে তিনি পশ্চিমা সংগীতের বিশাল পরিমাণ ডিস্ক নিজের লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করেছিলেন।

কালো সুন্দরী নিজের তত্ত্বাবধানে ইয়াহিয়া খানের সংগীত ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশাল সংগ্রহশালা দেখাশোনা করত।

জেনারেল রানি এদের নিয়ে একটা গল্প বলেছিল। তার দাবি ছিল কালো সুন্দরীকে পূর্ব পাকিস্তানের শত্রুপক্ষ অত্যন্ত সুকৌশলে ইয়াহিয়া খানের হারেমখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে কালো সুন্দরী ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব দখল নিয়ে নেয়। এমনকি সে পাকিস্তান সরকারের অত্যন্ত গোপন নথির বিষয়ে অনেক কিছু জানত।

কালো সুন্দরী বাঙালি হওয়ার কারণে ইয়াহিয়া খানের হারেমখানায় বেশ ব্যতিক্রম একটা জায়গা দখলে নিতে পেরেছিল।

পাকিস্তানের বিখ্যাত পত্রিকা আল ফাতেহের মতে ইয়াহিয়া খানের হারেমের অন্য সুন্দরীরা যেভাবে শুধু মাত্র শরীরের জন্য ব্যবহৃত হতো কালো সুন্দরী তেমনটা ছিল না। কালো সুন্দরী বাঙালি ছিল একই সাথে অত্যন্ত শিক্ষিত ইংরেজি জানা ও শিল্প সাহিত্যের বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল। ফলে তার অবস্থানটা ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় আর স্পর্শকাতর। তাকে নিয়ে কেউ কিছু বলার সাহস পেত না। সে ছিল সবার মধ্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

পাকিস্তানের নাবায়ে ওয়াক্ত একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল যে ইয়াহিয়া খানের শেষ মুহূর্তগুলোতে পররাষ্ট্র বিষয়ে একমাত্র জেনারেল পিরজাদা যিনি তখন ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র দফতর দেখাশোনা করতেন তিনি ছাড়া আর কেউ কথা বলার সাহস পেতেন না। হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র পত্রিকা তখন কালো সুন্দরীর এই ক্ষমতার বিষয়টাকে ছাপতে সাহস করেছিল।

যাই হোক ১৯৭১ এর এপ্রিল থেকে ইয়াহিয়া খানের সাথে কালো সুন্দরীর সম্পর্ক সুদৃঢ় হতে শুরু করে যা বজায় থাকে ইয়াহিয়া খানের পতন পর্যন্ত।

জেনারেল রানির মতে এই কালো সুন্দরীই ইয়াহিয়া খানের হাত দিয়ে পাকিস্তানের পতন ডেকে এনেছিল।

কালো সুন্দরী নিজের শারীরিক চমৎকারিত্ব আর বুদ্ধিবৃত্তি এবং জ্ঞান দিয়ে নিজের স্বামীকে প্রেসিডেন্ট হাউসের চিফ সিভিলিয়ান সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে মনোনয়ন দেয় এবং তার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাকে অস্ট্রেলিয়াতে পাঠায়। অবশ্য কারো কারো মতে ইয়াহিয়া খান নিজেই উদ্যোগী হয়ে কালো সুন্দরীর স্বামী জনাব কে এম হুসাইনকে অস্ট্রেলিয়াতে নিয়োগ দেন। যাতে করে ইয়াহিয়া খান পরিপূর্ণভাবে কালো সুন্দরীকে নিজের হাতের মুঠোয় সব সময়ের জন্য পেতে পারেন।

প্রত্যাশিতভাবে কালো সুন্দরী এটা চাইছিল। ইয়াহিয়া খান কালো সুন্দরীকে পররাষ্ট্র অফিসে বিশেষ দায়িত্ব দেন। কী ধরনের বিশেষ কাজ তিনি করতেন সেটা কেউ বলতে পারে না। পররাষ্ট্র বিষয়ে কালো সুন্দরীর নানা ধরনের কাজের কথা আমরা এর মধ্যে বলেছি। ইয়াহিয়া খানের সুন্দরী রমণীদের মধ্যে একমাত্র কালো সুন্দরীই খুব ভালো ইংরেজি বলতে পড়তে আর লিখতে পারত। সেজন্য জেনারেলদের কাছে পররাষ্ট্র বিষয়ে যত ফাইল আসত সবগুলো ফাইলে কালো সুন্দরী চোখ বুলাত।

ইয়াহিয়া খানের একটা অভ্যেস ছিল তিনি নিজের ঘরে বসে রাত দশটার পর এই সব ফাইলগুলোতে চোখ বুলাতেন। তখন কালো সুন্দরী তার সাথে পররাষ্ট্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করত।

যখন সব কিছু শেষ হয়ে আসছিল আর যুদ্ধের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল তখন ইয়াহিয়া খান কালো সুন্দরীকে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য তিনি অভ্যুত্থানের কারণে দায়িত্ব নিতে পারেনি। সুইস গভর্নমেন্টও এই ধরনের দায়িত্বে কালো সুন্দরীর মতো একজনকে মনোনয়নের বিষয়ে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল।

অসংখ্য পাকিস্তানি মনে করে যে ইয়াহিয়া খানকে শুধু শারীরিক সঙ্গ দিতেই কালো সুন্দরী ছিল না বরং একই সাথে বসের জন্য নানা চাহিদার সুন্দরীদের যোগান ও বসের শিল্প সংস্কৃতিগত আত্মার খোরাকের যোগান দেয়ার কাজটাও সে করত।

এটা অবশ্য দারুণ মজার বিষয় যে ইয়াহিয়া খানের সাথে যে সমস্ত নারী তার যৌন জীবনের সাথি হয়েছিল তারা আদর্শগত কারণেই ইয়াহিয়ার সাথে থাকত। এবং ইয়াহিয়া খানের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করত। ইয়াহিয়া খান নিজে অবশ্য কখনো কোনো সুন্দরীকে প্রতারণাপূর্ণভাবে কিংবা ছিনালি করে বিছানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেননি। কথাটা ইয়াহিয়ার পক্ষে চলে যায়।

তবে এটাই সত্য ছিল। এই রকম কোনো অভিযোগ ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি যে সুন্দরী রমণীরা অতীতে ভালো ছিল কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সাথে মিশে তারা নষ্ট হয়ে গেছে। বরং ইয়াহিয়া খানের সাথে মেশার আগেই তাদের চরিত্র খারাপ ছিল।

কালো সুন্দরী মিসেস হোসাইনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আমি (গ্রন্থের লেখক) নিজে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার খুব উচ্চ পদস্থ এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে কালো সুন্দরীর স্বামী জনাব হোসাইন ইসলামাবাদে বদলি হওয়ার আগেই মিসেস হোসাইনের ছিনালিপনার কানাঘুষা ঢাকায় শোনা যাচ্ছিল। আমেরিকান তেল কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে তার দহরম ছিল ঢাকার উচ্চবিত্ত সমাজের রসালো আলাপের অংশ।

ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচিত হওয়ার আগেই কালো সুন্দরী তার আমেরিকার বন্ধুর নিমন্ত্রণে আমেরিকা থেকে ঘুরে এসেছিল।

১৯৭২ এর মার্চ মাসে লাহোরের নাবায়ে ওয়াক্ত পত্রিকা কালো সুন্দরী আর ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে নতুন একটা সংবাদ প্রকাশ করে যা ইয়াহিয়া খান ও কালো সুন্দরীর লাম্পট্যময় সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ইয়াহিয়া খানের বড় ছেলে পঁচিশ বছরের আলী ইয়াহিয়া কালো সুন্দরীর জন্য প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায়ই রাওয়ালপিন্ডির হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কালো সুন্দরীর অভিজাত ফ্লাটে ঘুরতে যেত। ততদিনে কালো সুন্দরী মিসেস হোসাইনকে তার ছেলেমেয়েরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা আলাদা বাংলো নিয়ে সেখানে বসবাস করত।

ডিসেম্বরের এক সকালে ইয়াহিয়া খান আর তার ছেলে আলী ইয়াহিয়া দুজনেই কালো সুন্দরীর জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। ইয়াহিয়া খান কালো সুন্দরীর জন্য অস্থির হয়ে তার বাংলোতে গিয়ে নিজের ছেলেকে দেখতে পান। তখন তিনি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ছেলেকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু তার ছেলে চলে যেতে রাজি হয়নি। ইয়াহিয়া খান সে সময় ছেলের বেয়াদবি সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে বন্দুক দিয়ে তাড়া করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে যে এই সময় কালো সুন্দরীর হস্তক্ষেপে বিষয়টার মীমাংসা হয়। কালো সুন্দরী ছেলেকে চলে যেতে বলে।

একই সাথে আরো কিছু পত্রিকা এই সময় বলে যে ইয়াহিয়া খানের ছেলে আলী ইয়াহিয়া বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে দেখা করে তার বাবার চরিত্রের বিষয়ে নানা রকম কথা বলে বেড়ানো শুরু করেছিল। ঘটনা শুনে ইয়াহিয়া খান ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলেকে গভর্নমেন্ট হাউসে ঢোকা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। শুধু

তাই নয় হাউসের আশপাশে তাকে দেখলে কারাগারে পাঠানো হবে বলেও হুমকি দিয়েছিলেন।

পুরো পরিস্থিতিটা তখন বেগম ইয়াহিয়া নিজে সামাল দিয়েছিলেন। বেগম ইয়াহিয়া ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক আর পরহেজগার ছিলেন। ছেলে আর পিতার সম্পর্ক এবং যেভাবে তাদের পদস্খলন হয়েছিল সেটা নিয়ে তিনি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পিতা-পুত্রের অধপতনকে তিনি পুরো জাতির জন্য একটি দুর্যোগ বলে মনে করতেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের আমার খুব ভালো একজন বন্ধু যে কিনা পাকিস্তানে বেশ সুদৃঢ় অবস্থানে ছিলেন আমাকে কালো সুন্দরীকে নিয়ে পিতা-পুত্রের মাঝে যে বৈরী সম্পর্ক চলছিল সে বিষয়ে একটা ঘটনা বলেছেন। আমি দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়াতে এই বিষয়ে একটা কলাম লিখেছিলাম। আমার বন্ধুর তথ্য মতে ইয়াহিয়া খানের ছেলে আলী ইয়াহিয়া কালো সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল না। বরং সে কালো সুন্দরীর উনিশ বছরের কন্যার জন্য উন্মাদ ছিল। তাদের দুজনকে বেশ কয়েকবার বিব্রতকর অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কালো সুন্দরী তখন ইয়াহিয়া খানের মাধ্যমে বিষয়টা মিটমাট করতে চেয়েছে। তিনি আরো বলেন যে ইয়াহিয়া খান মাঝে মধ্যে ইন্টার কন্টিনেন্টালে কালো সুন্দরীর সাথে দেখা করতে আসতেন। তবে ইয়াহিয়া খান আর তার ছেলের মধ্যে কালো সুন্দরীকে নিয়ে যে নাটকীয় ঘটনার বর্ণনা নাবায়ে ওয়াক্ত উল্লেখ করেছিল সেটার আসলে কোনো ভিত্তি নেই।

নয়া দিল্লির সাথে পাকিস্তানের একটি উচ্চতর বৈঠকের সময় আমি পাকিস্তানের সদস্যদের সাথে আসা একজন সাংবাদিক বন্ধুকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন নাবায়ে ওয়াক্ত ইয়াহিয়া খান আর তার ছেলের সাথে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তার সত্যতা আছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানের মনোনীত আরো অনেক ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন যারা তাদের বসের ইমেজকে অটুট রাখতে সব সময় চেষ্টা করেছেন এবং সব সময় বলেছেন কালো সুন্দরীর সাথে ইয়াহিয়া খানের কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। আমার সাংবাদিক বন্ধু বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলেছিলেন যে বাবা আর ছেলে দুজনেই নারী আর মদের বিষয়ে উন্মাদ ছিলেন। তাদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আলী ইয়াহিয়া যখন দেখল যে কালো সুন্দরী কেবল তার বাবার জন্যই কাজ করছে এবং কালো সুন্দরীকে কোনোভাবে নিজের জন্য বাগে আনা যাবে না তখন সে নিজের চাইতে দ্বিগুণ বয়সী নারীদের সাথে মেলামেশা করতে শুরু করল। বাপ

আর ছেলের মাঝ খানে কালো সুন্দরী যেন তাদের যৌন জীবনের একটা মানদণ্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, দেশের ভেতরে রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কালো সুন্দরী ছিল একমাত্র বাঙালি নারী যে যুদ্ধের পরে পাকিস্তানের নানা পরিবর্তনের পরেও নিজের ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পেরেছিল। এমনকি তার স্বামী নিজ কাজে ফিরে আসার পর এবং কালো সুন্দরী পররাষ্ট্র বিষয়ক সমস্ত কাজ থেকে অবসরে যাওয়ার পরেও রাওয়ালপিন্ডিতে বেশ দাপটের সাথেই বসবাস করত। শুধু তাই নয় নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথেও বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল তার।

পাকিস্তানের প্রথম সারির পত্রিকাগুলো কালো সুন্দরীর এই ধরনের জীবন যাপনের কারণে তাকে ডাকত ক্লিওপেট্রা অব পাকিস্তান নামে।

শোনা যায় যে, সে ১৯৭১ এর আগস্টের পর মধ্য ইয়োরোপে চলে যায়। সেখানেই তার স্বামী সন্তানসহ বসবাস করতে শুরু করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে দেশের সরকার নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে বললেও সে তাতে সাড়া দেয়নি। পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়েই সেখানে থেকে যায়।

আমার মতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে তার আসলে করার মতো কিছু ছিল না। বাংলাদেশের সংগ্রামেও তার করার মতো কিছু ছিল না। কারণ বাংলাদেশের দেশ প্রেমিক মানুষ কিছুতেই তাকে গ্রহণ করত না। বরং তার প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ছিল সকলের। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের সংগ্রামের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তাকে হত্যা করার জন্য একবার আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল।

বাংলাদেশের আমার বন্ধুরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের দোসররা বাংলাদেশের উপর যে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল তা থেকে কিছুটা হলেও ইয়াহিয়া খানকে রক্ষা করার জন্য কালো সুন্দরীকে সামনে নিয়ে এসেছিল।

৬.

জেনারেল রানির আত্মজীবনী

ইয়াহিয়া খানের যৌন অভিযানমূলক জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য আর চমৎকার আকর্ষণীয় চরিত্রটা ছিল জেনারেল রানি। একজন পাকিস্তানি ভাষ্যকারের মতে ইয়াহিয়া খানের হারেম জীবনের অন্য সব নারীরা ছিল মিটমিটে আলো প্রদানকারী তারকার মতো সেখানে জেনারেল রানি ছিল ইয়াহিয়া খানের সমস্ত বান্ধবীদের 'কমান্ডার অব ন্যাশনাল গার্ড।'

লাহোরে ১৯৭১ এর মে মাসের আগ পর্যন্ত আটচল্লিশ বছর বয়স্কা জেনারেল রানি সকলের কাছে একদম অপরিচিত ছিল। ভালোভাবে উর্দু বলতে পারত না, প্রায় অশিক্ষিত, মূর্খ জেনারেল রানি পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমের কলামে কোনো জায়গা দখল করার মতো দাবিদার কখনোই ছিল না। রানির স্বামী ছিলেন পাকিস্তানি পুলিশের জুনিয়র কর্মকর্তা। যিনি ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব শেষ করে অবসরে গিয়েছিলেন। রানি ইন্দো পাক বর্ডারের জম্মু অংশের গুজরাট শহরে বাস করত। তার দেশের ভাগ্য বিধাতা ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় হওয়ার পরই সেও কিন্তু একজন প্রভাশালী ব্যক্তিতে পাল্টে গেল। এমনকি ঐতিহাসিকদের জন্য পাকিস্তানের ক্রান্তিকালীন সময়ের অন্ধকার ইতিহাসের একজন বড় উৎসে পরিণত হলো জেনারেল রানি। সে যাই বলত সেটাই একটা করে সাক্ষী সবুদে পাল্টে যেত। তার দাবির বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের হারেমখানার অন্ধকার জীবনের কেউ কিছুই বলার সাহস রাখত না কিংবা এর বিরোধিতা করার সাহস পেত না। একমাত্র নুরজাহান তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখিয়েছিল।

রানি যেভাবে সব কিছু প্রকাশ করা শুরু করেছিল সেটা আসলে এক ধরনের পাওয়ার অব ব্ল্যাকমেইল ছিল এবং এই ধরনের ভাষণ দিয়ে অনেকের মুখ বন্ধ করে দেয়া সম্ভব ছিল।

রানি সর্বপ্রথম পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমের হেডলাইনে আসে গরম একটা খবর দিয়ে।

বিখ্যাত গায়িকা নুরজাহানের সঙ্গে ইয়াহিয়া খান

লাহোরের সংবাদপত্রগুলো তাদের পত্রিকার প্রথম পাতায় সংবাদ পরিবেশন করে যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের একটি অভিজাত রুমে জেনারেল রানিকে মদ্যপ অবস্থায় এবং পুলিশের সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণরত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের ভাষ্যমতে আকলিমা আখতার যে জেনারেল রানি নামে পরিচিত প্রতিদিন ৩৫০ রুপি ভাড়ার বিনিময়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দামি একটা রুম ভাড়া করে সেখানে দেহব্যবসা চালাচ্ছে। তার এই কাজের সাথে আছে তার কিশোরী মেয়ে ও লাহোরের হিরামন্ডি এলাকার কিছু দেহপসারিণী।

হোটেলের কিছু বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জেনারেল রানির গ্রেফতারের বিষয়টা আলোচনার কেন্দ্রে আসার কারণ ছিল তার সাথে একই সময় লাহোরের কয়েকজন ধনাঢ্য প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করা হয়। আরো চমকপ্রদ অংশ ছিল তাদের সাথে সাথে একজন নেতৃত্বস্থানীয় দেহপসারিণী নীলকমল, তার মেয়ে ও সরকারের দুজন অত্যন্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকেও গ্রেফতার করা হয়।

পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমকে সরকার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে সরকারের দুজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার নাম পত্রিকায় আসেনি। তবে তাদের দুজনের নাম সাংবাদিকরা ঠিক জানতে পেরেছিল। কিন্তু নাম প্রকাশ করার সাহস তারা করেনি। যে তিনজন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন চোরাকারবারির সাথে জড়িত ছিল। অন্য জন ছিল সম্পদের জাদুকর। তিনি আইয়ুব খানের সময় থেকে ব্যবসা করছিলেন। ইয়াহিয়া খানের সময় এসে আরো লক্ষ লক্ষ রুপি উপার্জন করেছেন। এমনকি ইয়াহিয়া খানের পরবর্তী সরকারের সাথেও তার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল।

আমার উৎস মতে যে দুজন সরকারি কর্মর্কতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সিনিয়র কাস্টমস অফিসার আর অন্য জন ছিলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সির সুপারিনটেনডেন্ট।

তবে গ্রেফতার ঘটনার চমৎকারিত্ব এখানেই শেষ হয়নি। সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থা ছিল গ্রেফতার হওয়া রানির দুজন সহকারী বন্ধু ছিলেন প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ব্যক্তিগত সহকারী। যাদেরকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়। সেই দুজনের একজন ছিলেন প্রেসিডেন্টে ভুট্টোর ব্যক্তিগত প্রেস সহকারী। তার নাম খালিদ হোসাইন। খালিদ হোসাইনকে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকরা অত্যন্ত দক্ষ একজন সাংবাদিক হিসেবে চিনতেন। বিশেষ করে সিমলা সম্মেলনের সময় তার ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। খালিদ হোসাইন পরবর্তীতে সংবাদপত্রের সাথে সম্পর্কিত বিভাগে সুইজারলেন্ডে পাকিস্তানি দূতাবাসে স্থানান্তরিত হন। জেনারেল রানির সেই প্রমোদ অনুষ্ঠানের গ্রেফতার হওয়া আরেকজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন প্রেসিডেন্টের নেভাল অ্যাডভাইজর। ঐ ঘটনার পরপরই ভদ্রলোক অবসরে চলে যান।

সাবেক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের কুকীর্তির তদন্ত করতে গিয়ে যখন বর্তমান সরকারের দুজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা এইভাবে ধরা পড়েন তখন বিষয়টা সরকারের জন্য খুব বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সরকার তড়িৎ গতিতে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে পুরো বিষয়টাকে পাবলিকের চোখে ধুলা দিয়ে ধামা চাপা দিয়ে দেয়।

পুলিশের সেই গ্রেফতারি অভিযানের পর রানিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল নাকি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বিষয়টা তেমনভাবে আর প্রকাশিত হয়নি। তবে পাকিস্তানের পরাজয়ের পিছনে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তিরই লাম্পট্যতা দায়ী ছিল না বরং পুরো সিস্টেমটাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এই বিষয়টা রাজ সাক্ষীর মতো জেনারেল রানি সকলের কাছে প্রকাশ করেছিল।

সংবাদ মাধ্যম রানির বিবৃতিগুলো ছবিসহ প্রকাশ করার জন্য তাদের কাগজের বিশাল অংশ ছেড়ে দিল। তারা বেশ রসিয়ে চটুল আকারে গ্রেফতারের পর রানির এবং গ্রেফতারের পূর্বে রানির সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছিল সেটারও বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

লাহোরের নাবায়ে ওয়াক্ত পত্রিকা এক সংবাদে বলল যে পুলিশ যখন হোটেল কন্টিনেন্টালে অভিযান চালায় সেই সময় পার্টির উগ্রতা চরমে ছিল। দামিদামি হুইস্কিগুলো পানির প্রবাহের মতো মেঝেতে ভাসছিল। আমদানি করা অনেক দুলর্ভ শ্যাম্পেনের বোতলও উদ্ধার করা হয়। বিখ্যাত দেহপসারিণী নীলকমল তখন মঞ্চে গান গেয়ে আর উদ্যম নৃত্য করে সবাইকে মুগ্ধ রেখেছিল। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক রানি কারো বিনোদনে যেন ঘাটতি না হয় সেটা খুব ভালোভাবেই লক্ষ করছিল। অনুষ্ঠান বিভক্ত ছিল দুটো অংশে। মঞ্চের সামনের অংশে কেবল গান নৃত্য আর হুল্লোড় চলছিল। হোটেল মঞ্চের পেছনে অত্যন্ত গোপন জায়গায় ছিল দ্বিতীয় অংশ। সেখানে খুব অল্প কয়েকজন অভিজাত মেহমানরা যৌনকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। রানি সাত থেকে আটজন অল্পবয়স্ক সুন্দরী তরুণিকে ব্যস্ত রেখেছিল তারা যেন মেহমানদেরকে ঠিকমত বিনোদন দিতে পারে।

পুলিশ যখন অভিযান চালায় তখন তিনজন মেয়ে আর চারজন পুরুষকে অপ্রীতিকর অবস্থায় সেখানে পাওয়া যায়। তাদের কারো শরীরেই কাপড় ছিল না। তারা ঠিকমত কাপড় পরার জন্য পুলিশের কাছে হাত জোর করে সময় চেয়েছিল।

রানি নিজেও মদ খেয়ে এত মাতাল ছিল যে কী ঘটছিল সে কিছুই বুঝতে পারেনি। পুলিশ ভ্যানে বসে সারাক্ষণ সে একটা কথাই বলছিল, 'নকশা বিগার গায়া' পরিকল্পনা সব নষ্ট হয়ে গেল।

পুলিশ লকআপে গিয়েও সে পরিস্থিতির বিষয়ে কোনো কিছুই ধারণা করতে পারছিল না। সে বরং হইচই করে পুলিশদের সাথে চিৎকার করে বলছিল– এখানে অনেক গরম এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করো, আমার জন্য ঠান্ডা কোকা কোলা নিয়ে আসো। তাকে বলা হলো পুলিশ লকআপে কোনো এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা নেই। আর আপনার জন্য কোনো কোকা কোলার ব্যবস্থা করা যাবে না।

এই কথা শোনার পর রানি চিৎকার করে বলল, 'আমি এ কথাটাই সব সময় ইয়াহিয়া খানকে বলতাম যে আপনার পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত খারাপ। মেহমানদেরকে রাখার জন্য তাদের কোনো এয়ারকন্ডিশন নেই।'

সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কনস্টেবলকে একশো রুপির একটা নোট দিয়ে কয়েক বোতল কোকা কোলা নিয়ে আসতে বলল আর বাকি টাকা নিজের জন্য রেখে দিতে বলল। সে আরো কিছু প্রস্তাব পুলিশদেরকে দিল। তবে পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তারা তার কোনো কথা কানে নেননি। ফলে সে রাতটা তাকে হোটেল কন্টিনেন্টাল থেকে বন্দী করে নিয়ে আসা বাকি মেয়েদের সাথেই পুলিশের থানায় কাটাতে হয়েছিল।

তারপর দিনই অবশ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। জেনারেল রানি নিজের জন্য একজন ল ইয়ার ব্যবস্থা করে জামিনের ব্যবস্থা করল। একই সাথে অন্য বন্দী মেয়েগুলোরও জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা করল।

পুলিশ লকআপ থেকে বের হয়ে জেনারেল রানি দারুণ মজার একটা বিবৃতি দিল। সে বলল যে পাকিস্তানের দুর্নাম রটানোর জন্য পাকিস্তানের শত্রুরা পুলিশকে দিয়ে এই ঘৃণ্য বন্দী নাটকের ব্যবস্থা করেছে। সে আরো অভিযোগ করল যে দেশের উচ্চ পদ দখল করা কিছু ব্যক্তি তাকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে কারণ গত সরকারের সাথে সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেশের জন্য কাজ করেছিল। সংবাদিকরা যখন তাকে প্রশ্ন করল যে সরকারের সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কারা। রানি তার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলল ইয়াহিয়া খানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা কিছু কর্মকর্তা যারা সব সময় তার বিরুদ্ধে দুর্নাম করে আসছিল।

লাহোরের মাশরিক নামের পত্রিকার এক সংবাদিক বলেছেন যে সংবাদ মাধ্যম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ে রানির কাছ থেকে নানা ধরনের সংবাদ শুনে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তারা রানিকে জানত একজন অশিক্ষিত নারী হিসেবে।

দেশের পররাষ্ট্র বিষয়ে তার ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে রানি বলে যে 'আমি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খানকে বাধা দিয়েছিলাম। একই সাথে আমি ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যেন ভুট্টোকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আমাকে বললেন যে জনাব ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী বানানো যাবে না। কারণ তিনি সবচেয়ে বেশি জনমত পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখন আমি ইয়াহিয়া খানকে বললাম তাহলে দুজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করুন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ভুট্টোকে।'

সংবাদ মাধ্যম এটা জানত যে জনাব ভুট্টো একবার বলেছিলেন যে পাকিস্তানের সংকটকালীন সময়ে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের

সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেটা কি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রিত্ব ভাগাভাগি করে দেয়ার মাধ্যমে নাকি অন্য কোনো উপায়ে তা নিয়ে তর্ক করার সুযোগ আছে। কিন্তু এই রকম একটা বিষয় রানির মতো একজন মহিলার কাছ থেকে সংবাদ মাধ্যম শুনে বেশ বিব্রত বোধ করল।

জেনারেল রানি আরো দাবি করে যে 'যারা এখন বলে যে তারা পাকিস্তানের সংকটকালীন সময়ে পাকিস্তানের রক্ষাকর্তা ছিল তারা সবাই মিথ্যাবাদী। আমি তাদেরকে খুব ভালো করেই চিনি। শুরু থেকেই এরা ইয়াহিয়া খানকে বোকা বানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ভার গ্রহণের ষড়যন্ত্র করছিল। শুধু তাই নয় এরা সবাই ইয়াহিয়া খানের মদ্যপ আর লাম্পট্য জীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল। এই মানুষগুলোই ছিল শত্রুপক্ষের লোক। এরা ইয়াহিয়া খানের প্রেসিডেন্ট হাউসে শত্রুপক্ষের সুন্দরী নারী চরদেরকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যারা ইয়াহিয়া খানকে আরো লাম্পট্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই লোকগুলো আমাকে ভয় পেত। তারা ভাবত যে আমি ইয়াহিয়া খানের চোখের ধুলা সরিয়ে দেব। ইয়াহিয়া খানকে সব কিছু বলে দেব। তাই তারা আমার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র শুরু করে দিল। আমার বিরুদ্ধে চুরি, আর পতিতালয় চালানোর অভিযোগ করা হলো।'

'তবে মূল কথা হলো' জেনারেল রানি আরো বলে, 'যে লোকগুলো ইয়াহিয়া খানের পাশে ছিল তারা কীভাবে একের পর এক ইয়াহিয়া খানকে দিয়ে উপকৃত হচ্ছিল সেটা আমি জানতাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই লোকগুলোর জন্য আমার দেশের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অনেক দুর্নাম হয়েছে একই সাথে দেশেরও অনেক দুর্নাম হচ্ছে। তাই আমি তাদের বিষয়গুলো গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি কারো নাম বলতে চাই না যাতে করে শত্রুপক্ষ বলতে পারে এই যে ইয়াহিয়া খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবার আরেকজন আসছে।'

'যারা আমাকে অত্যাচার করছে আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি যে'– এই সময় রানির কণ্ঠে বেশ দেশপ্রেমের সুর ফুটে উঠল; 'প্রথমত এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের কোনো ফটোগ্রাফিক কিংবা কাগজে কলমের প্রমাণ আমার কাছে নেই, আর দ্বিতীয়ত তাদের অপকর্মের বিষয়ে যতটুকু সাক্ষী সাবুদ এবং প্রমাণ আমার কাছে আছে আমি মরে গেলেও সেটা কারো কাছে বলব না।'

জেনারেল রানির মতে কিছু লোক তাকে ভয় পেত যে সে অনেক কিছু জানে। রানি বলেন, 'কিন্তু আমার শরীর থেকে যদি মাথা পৃথক করে ফেলা হয় তবুও আমি তার কিছুই বলব না।'

রানিকে মনে করা হতো জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সময়ের বিস্ময়কর একটা চরিত্র। এক বছর ইয়াহিয়া খানের হারেমের পুরো নিয়ন্ত্রণ সে করেছিল।

১৯৭২ এর শেষের দিকে খুব দামি বিলাসবহুল একটা হোটেলে রানির সাথে আমার সর্বশেষ দেখা হয়। তখন সে মাত্র নানা ধরনের মূল্যবান সামগ্রী, বিদেশি মদের বোতল চুরি আর পাচারের অভিযোগে পুলিশের বন্দিখানা থেকে লাহোর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে জামিন পেয়েছিল। এই ধরনের জিনিসপত্র চুরি করার বয়স তখন তার ছিল না কিংবা প্রয়োজনও ছিল না। পুলিশের মতে রানি ছিল ইয়াহিয়া খানের অপকর্মের জন্য দুর্দান্ত এক প্রতিভা।

পুলিশের পক্ষ থেকে যখন রানির বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয় তখন আগের অপরাধের মতোই এই অপরাধের পুলিশ কেসটাও কোনো এক রহস্যময় কারণে স্থগিত হয়ে যায়। তার দাবি একজন বিদেশি পুস্তক প্রকাশক তাকে একটা বই লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। বইয়ের নাম আমি ও ইয়াহিয়া খান।

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো সেই বিদেশি প্রকাশকের নাম কী সে বলতে অস্বীকার করল।

তবে নানা ধরনের উৎস থেকে জানা গেল যে সেই প্রকাশক বেশ নামী দামি প্রকাশক এবং ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত জীবন তার উত্থান পতন নিয়ে একটি বই লেখার জন্য সেই প্রকাশক জেনারেল রানিকে বেশ মোটা অংকের টাকা দিয়েছিলেন। করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোরের হোটেল কন্টিনেন্টালে বেশ সৌখিন আর দামি কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল রানির জন্য। শুধু তাই নয় খুব ভালো একজন স্টেনোগ্রাফার ও অনুবাদককেও রানির এই কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যেন রানি যা বলতে চায় তার সব কিছুই বেশ ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

আমি (গ্রন্থের লেখক) যখন একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে রানির সাথে দেখা করতে গেলাম তখন রানি আমাকে দেখে পাকিস্তানি সাংবাদিকের উপর খুব রেগে গেল। সে বলল, 'এই বেজন্মা পাকিস্তানি সাংবাদিকগুলো টাকার জন্য যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আমি জানি না ইন্ডিয়াতে কী হচ্ছে তবে এটা জানি বেজন্মা পাকিস্তানিগুলোর চেয়েও ভয়ানক খারাপ ঐ ইন্ডিয়ানগুলো।'

কিছুক্ষণ শান্ত হওয়ার পর সে এবার বলল, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইয়াহিয়া খানের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তবে অর্বাচীন তরুণ আমি তোমাকে বলতে পারি সে সম্পর্ক কেবল একজন চাচার সাথে তার

ভাতিজির যেমন সম্পর্ক তেমনটা ছিল। সে আমার সাথে একজন চাচা যেমন তার ভাতিজির সাথে ভালো আচরণ করে তেমনটা করত। একজন পুরুষ হিসেবে তার দুর্বলতা কী ছিল সেটা আমি জানতাম। তার শারীরিক প্রয়োজনের যোগান আমি দিতাম। তার রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন তার যত মেয়ে বান্ধবীরা প্রেসিডেন্ট হাউসে তার কাছে আসে তাদের যেন সব খোঁজখবর আমি করি। ইয়াহিয়া খানের উপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি এতে সম্মত জানিয়েছিলেন। মেয়েলি বিষয় থেকে শুরু করে কোনো বিষয় আমি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিতাম না। এমনকি ইয়াহিয়া খানের মদ খাওয়ার বিষয়েও আমি তাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতাম। সন্ধ্যার পর তার প্রিয় ব্ল্যাক ডগ থেকে তাকে অর্ধেক বোতলের বেশি খেতে দিতাম না। তার উপর আমার এই প্রভাবের কথা জানতে পেরে দেশের শত্রুরা এবং তোমাদের এজেন্টরা ইয়াহিয়া খানের কানে আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই বলা শুরু করল। এমনকি তাকে এটাও বোঝাল যে শত্রুপক্ষ আমাকে তার এখানে নিয়োগ দিয়েছে। আমি তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে খাবারে তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছি। এই জন্য তার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করল। তার শাসনামলের শেষ দিকে প্রায়ই তার সাথে আমার ঝগড়া হতো। এমনকি আমি তাকে সতর্ক করেছিলাম যে ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া পাকিস্তানের জন্য শুভকর হবে না। বরং উচিত হবে সেই মুহূর্তে ক্ষমতা ভুট্টোর কাছে হস্তান্তর করা। তবে ইয়াহিয়া খান সেই সময় কতগুলো দুষ্টলোক দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকার কারণে আর বিশেষ করে তার আশপাশে পাকিস্তানের সুন্দরী রানি নুরজাহানের মতো মেয়েদের দিয়ে আবিষ্ট হওয়ায় তিনি আমার কথা কানে নিলেন না। বরং আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।'

ইয়াহিয়া খানের অন্ধকার দিনগুলোর আরেক গুরুত্বপূর্ণ সাথি ছিলেন নুরজাহান। ইয়াহিয়া খানের শেষ দিনগুলোতে নুরজাহানের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। চিফ অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জেনারেল উমারের এক অনুষ্ঠানে নুরজাহান প্রধান গায়িকা ছিল। সেখানে মধ্যবয়স্কা আকর্ষণীয় নুরজাহানের সাথে ইয়াহিয়া খানের পরিচয় হয়।

রানির মতে 'ইয়াহিয়া খান মেয়েলি বিষয়ে যথেষ্ট ভদ্র ছিলেন। ত্রিশ বছর বয়সের কোনো নারীর প্রতিই তার কৌতূহল ছিল না। এমনকি সেই বয়সের কোনো মেয়েকে ভোগ করতে তার আগ্রহ ছিল একদম কম। তবে নটি টাইপের নষ্টাভ্রষ্টা মধ্যবয়স্কা মেয়েগুলো যারা সত্যিকার অর্থেই জানে যৌনতা কী তাদের প্রতি ইয়াহিয়া খানের আগ্রহের কমতি ছিল না। এজন্যই তার সমস্ত বান্ধবীরা ছিল মধ্য বয়স্কা। এই শ্রেণিতে নুরজাহান ছিল একদম উপযোগী

একজন নারী। নুরজাহানের গানের একটা রেকর্ড শুনে মামু (ইয়াহিয়া খান) মেয়েটাকে দেখতে চাইলেন। আমি তাকে বলেছিলাম সে কোনো কম বয়স্ক তরুণী নয় বরং সে হলো মধ্যবয়স্কা একজন নারী যার কয়েক ডজন ডিভোর্স স্বামী আছে। তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। বরং নুরজাহানের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য জেদ করতে শুরু করলেন। তাই আমি জেনারেল উমরের বাসায় একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম। সেখানে নুরজাহানকে প্রধান শিল্পী হিসেবে নিমন্ত্রণ করলাম। এজন্য তাকে নগদ পাঁচ হাজার রুপি দিলাম। সমান টাকার অলংকারও দিলাম। সে আসল আর মুহূর্তেই প্রধান ক্ষমতাবান ব্যক্তিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলল। ইয়াহিয়া খান এই মহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন। যার শরীরে তখন গলার স্বরটুকু আর কিছুই ছিল না। সেদিনই ইয়াহিয়া খান পাঁচ ঘণ্টা নুরজাহানের সাথে কাটালেন। তারা দুজন জেনারেল উমরের ছোট একটা কুঠুরিতে রাত কাটালেন। শেষ রাতের দিকে সে যখন বের হয়ে আসে তখন টালমাটাল অবস্থা তার। কারো সাথেই নুরজাহান কোনো কথা বলল না। এর পর থেকে সে আমার প্রধান শত্রুতে পাল্টে গেল। সে আমার কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের অলংকার ধার নিয়েছিল সেগুলো সে কখনো ফেরত দেয়নি।'

আমরা অবশ্য পরে নুরজাহানের সাথে কথা বলেছিলাম। নুরজাহানের গল্পগুলো যখন লিখছি তখন তার বিষয়ে অনেক খোঁজখবর করলাম। নূরজাহানের সাথে কথা বললাম। তার বিষয়ে রানি যে সব অভিযোগ করেছিল সেগুলো তাকে জিজ্ঞেস করলাম। নুরজাহান সব অস্বীকার করল। বলল তার পেশাগত সফলতা আর সুখ্যাতির কারণে সবাই তাকে ঈর্ষা করত। নুরজাহান আরো বলল রানি ছিল পেশাদার ব্ল্যাক মেইলার। সে সকলের বিরুদ্ধে লেগে থাকত আর ব্ল্যাক মেইল করে বেড়াত।

তবে ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে রানি আর নুরজাহানের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে। এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে দুজনে এক সাথে ঘোষণা করে যে তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। তারা একে অপরে সত্যিকারের বোন। তাদের মধ্যে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই।

তবে ১৯৭৩ এর আগস্টের দিকে রানি আবার সংবাদ শিরোনাম হয়। সে সাংবাদিকদের ডেকে এক সম্মেলনে বলে যে নুরজাহান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সাথে যে সব চুক্তি হয়েছিল তার সব কয়টিই নুরজাহান ভঙ্গ করেছে। রানি দাবি করে যে সে নিজে অত্যন্ত বড় হৃদয়ের মানুষ। সে চেয়েছিল নুরজাহানকে সাহায্য করতে। নুরজাহানের হারানো ইমেজ ফিরিয়ে আনতে। যাতে করে নুরজাহান আবার তার ছবি বানানোর

কাজে নেমে যেতে পারে। নতুন নতুন ছবির এসাইনমেন্ট যেন সে পায়। কিন্তু নুরজাহান তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বরং তার কাছ থেকে ৫০ হাজার রুপি মূল্যমানের যে অলংকার নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো ফেরত দেয়নি।

অপরদিকে নুরজাহান দাবি করে যে নারী নির্জলা মিথ্যে বলছে। শুধু তাই নয় সে প্রায়ই নুরজাহানকে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

এদিকে রানি করাচির জং পত্রিকায় দাবি করে যে ইয়াহিয়া খান ও তাকে নিয়ে যে সমস্ত রসালো গল্প প্রচলিত আছে তার সবগুলোই মিথ্যে। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। সে ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে কখনো কোনো সুবিধা ভোগ করেনি।

করাচির ডেইলি নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে রানি বলে যে সংবাদ পত্রগুলো তাকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে ভিত্তিহীন সব সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইয়াহিয়া খানের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টা নিয়ে সংবাদপত্র বাড়াবাড়ি করেছে। এছাড়া যে সমস্ত পত্রিকাগুলো বলছে যে সে ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ ভোগ করেছে তার পুরোটাই মিথ্যে। রানি দাবি করেছে যে সে ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে কোনো বাড়ি ঘর কিংবা একটা রুপিও নেয়নি। 'ইয়াহিয়া বরং আমার কিছু বন্ধুদেরকে সাহায্য করেছিলেন মানবিক দিক বিবেচনা করে যাদের জন্য ইয়াহিয়া খানের কাছে আমি অনুরোধ করেছিলাম।'

শুধু তাই নয় রানি আরো দাবি করে যে 'আমি পবিত্র কুরআন ধরে শপথ করে বলতে পারি সেই সময় আমি যে ক্ষমতাটুকু পেয়েছিলাম তার অসদ্ব্যবহার করে আমি ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা গ্রহণ করিনি। আমার ছেলে এখনো বেকার, আমার বিবাহযোগ্য কন্যার এখনো বিয়ে হয়নি, আমার স্বামী দীর্ঘ পঁচিশ বছর চাকরি করার পর পুলিশ ইনস্পেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছে। আমি যদি চাইতাম তাহলে ইয়াহিয়া খানকে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ রুপি উপার্জন করতে পারতাম। আমি যাদেরকে ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম সেই সমস্ত মেয়েরা এখন কোটিপতি।'

ইয়াহিয়া খানের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে রানি বলে যে, '১৯৬৫ এর শুরুর দিকে ইয়াহিয়া খানের সাথে তার পরিচয় হয়। ইয়াহিয়া খান তখন চাম্ব জুরিয়ান সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। তিনি তখন অনেক বড় সামরিক কর্মকর্তা হয়েও আমাদের ছোট বাড়িতে এসে নিমন্ত্রণ খেতে লজ্জাবোধ করতেন না। অনায়াসে আমাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। তার স্ত্রী সন্তানেরাও আমাদের বাড়িতে এক সাথেই আসতেন। আমার স্বামীর সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা গল্প গুজব করতেন।'

তার সাথে ইয়াহিয়া খানের শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে রানি কান্নায় ভেঙে পড়ে। রানি বলে, 'ইয়াহিয়া খান তার কাছে বড় ভাই কিংবা বাবার মতো ছিল।' রানি প্রায়ই ইয়াহিয়া খানকে মামু বলে সম্বোধন করত।

সংবাদ মাধ্যমগুলো বলে যে রানির আসল নাম ছিল আকলিমা আক্তার, ইয়াহিয়া খান তাকে রানি উপাধি দিয়েছিল। তাই সবাই তাকে রানি নামে ডাকত। এক সাক্ষাৎকারে রানি এই বিষয়টা পুরোপুরি অস্বীকার করে।

'ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমার এলাকার লোকজন আমাকে রানি নামে ডাকতেন। তারা আমাকে রানি নামে ডাকত কারণ দরিদ্র লোকদের মাঝে আমি অনেক জনপ্রিয় ছিলাম। তারা যখনই আমার কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে আমি যেভাবেই হোক তাদেরকে সাহায্য করেছি। ইয়াহিয়া খান শুধু মাত্র আমার নামের আগে জেনারেল উপাধি দিয়েছিলেন। আমাকে জেনারেল রানি নামে ডাকতেন পছন্দ করতেন। কারণ আমি ইয়াহিয়া খানের অনেক কাজ তার জেনারেল অফিসারদের তুলনায় দ্রুত করতে পারতাম। তবে ইয়াহিয়া খান জনসম্মুখে কিংবা তার অফিসারদের সামনে আমাকে কখনো জেনারেল রানি নামে ডাকতেন না। কারণ তিনি তার অফিসারদের যাদের পদবি জেনারেল ছিল তাদেরকে অসম্মান করতে পছন্দ করতেন না। তাদের সব সময় সম্মান করতেন।'

যারা ইয়াহিয়া খানকে একজন যৌনদানব হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে রানি বলে যে 'এটা সত্যি কথা নারী মাংসের প্রতি ইয়াহিয়া খানের দুর্বলতা ছিল। তবে একই সাথে এটাও সত্যি যে আমাদের দেশের বড় ব্যবসায়ীরা, উচ্চপদস্থ প্রশাসকরা তাদের সুন্দরী স্ত্রী, কন্যাদেরকে দিয়ে ইয়াহিয়া খানের সে পথটাকে আরো সহজ করে দিয়েছে। আমি দেখেছি বড় বড় কর্মকর্তারা তাদের আর্কষণীয় স্ত্রী আর অল্পবয়সী কন্যাদেরকে নিয়ে রাতের পর রাত ইয়াহিয়া খানের বেডরুমের জন্য অপেক্ষা করছিল। যে ব্যক্তিটা ইয়াহিয়া খানকে সবচেয়ে বেশি কলুষিত করেছিল সে হলো একজন ব্যাংকার। সে সুন্দরী তারানাকে একজন রাষ্ট্রদূতের মেয়ে হিসেবে ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।'

রানি আরো বলে যে 'অনেক সরকারি কর্মকর্তা অভিজাত দেহপসারিণীদেরকে নিয়ে এসে অমুকের বোন অমুকের কন্যা বলে ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিত।'

নুরজাহান আর তারানার পাশাপাশি রানি ব্ল্যাক বিউটিকে খুব অপছন্দ করত। রানি তার স্মৃতি কথায় উল্লেখ করে যে, 'এই কালো সুন্দরী নারীটি অত্যন্ত ভয়ানক ছিল। আমি নিশ্চিত সে শত্রুপক্ষের প্রশিক্ষিত একজন এজেন্ট

ছিল। কোনো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এই মহিলাটি ইয়াহিয়া খানের প্রেসিডেন্ট হাউসে এসেছিল। কালো সুন্দরী খুব ভালো করে জানত ইয়াহিয়া খানের বয়সী একজন পুরুষ কী ধরনের যৌন কর্ম পছন্দ করতে পারে, কী ধরনের আসনে সে অভ্যস্ত। সে শুধু যৌনকর্মেই পটু ছিল না বরং একই সাথে কথা দিয়ে মুগ্ধ করার মতো তার জাদুকরী ক্ষমতা ছিল। এই মহিলা ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার জন্য উৎসাহী করেছিল। আবার এই মহিলাই ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টোর সাথে মিটমাটের সময় মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি ইয়াহিয়া খানকে সব সময় বলতাম জনাব ভুট্টোর দূরদর্শিতা আর জনপ্রিয়তার উপর আস্থা রাখতে। কিন্তু এই কালো সুন্দরী ডাইনি সব সময় এর বিরোধিতা করত। এই কালো সুন্দরী ইয়াহিয়া খানকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছিল যে যুদ্ধ শেষ হলে চীন আর আমেরিকা ইয়াহিয়া খানকে সহায়তা করবে। কালো সুন্দরী প্রায়ই সকলের সামনে দাবি করত যে পৃথিবীর সব ক্ষমতাবান রাষ্ট্রদূতদের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক। দুঃখজনকভাবে ইয়াহিয়া খান তার সব কথা বিশ্বাস করেছিলেন। এই মহিলাটা এতই চতুর ছিল যে সে তার মেয়ে আর ছেলেকেও ইয়াহিয়া খানের পরিবারের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সে ইয়াহিয়া খান আর ইয়াহিয়া খানের ছেলে দুজনের সাথেই মধুর সম্পর্ক বজায় রাখত।

ইয়াহিয়া খানের শেষ দিনগুলোতে যে মহিলাদের সাথে ইয়াহিয়া খানের সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে কালো সুন্দরী ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর।'

রানি তার গল্প বলতে গিয়ে বলেন যে, 'আমি খুব দুঃখিত এই বিষয়ে ইয়াহিয়া খানকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারিনি। ১৯৭১ এর জুলাই এর দিকে ইয়াহিয়া খানের সাথে আমার ভুল বুঝাবুঝি হয়। আমি এখনো নিশ্চিত নই যে এই ঘটনার জন্য আসলে কে দায়ী ছিল। তবে আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে ইয়াহিয়া খানের কিছু জেনারেল যারা আমার ক্ষমতাকে ঈর্ষা করত তারা কয়েকজন সুন্দরীকে মনোনয়ন দিয়েছিল যেন তারা ইয়াহিয়া খানের কানে আমাকে নিয়ে সব সময় বিষোদগার করতে পারে। মিলিটারি ইন্টিলিজেন্সের ইনচার্জ জেনারেল উমর আমাকে এই বিষয়ে বলেছিলেন। আমি যখন দেখলাম যে ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে আসলে আমার নেয়ার মতো কিছু নেই তখন ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলাম। বিশেষ করে তার মন মেজাজ যখন খারাপ থাকত তখন তার সাথে দেখা করতাম না। তবে আমি নিশ্চিত যদি সে সময় তার কাছাকাছি থাকতাম তাহলে ঘটনাগুলো এত খারাপভাবে ঘটত না। আমাকে বলা হয়েছিল যে কালো সুন্দরী সেই সময়

প্রতি সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানকে দুই বোতল করে হুইস্কি খাওয়াত। আর তার কানে সব সময় ফিসফিস করে বলত যে বিরোধী রাজনীতিবিদদের সাথে আমার খুব দহরমমহরম সম্পর্ক। তাই আমি ইয়াহিয়া খানের খাবারে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছি। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ইয়াহিয়া খান এই সব কথা শুনতে শুনতে শেষ সময় এসে যখন কোনো হুইস্কির বোতল মুখে নিতেন তখন এক চুমুক কি দুই চুমুক অন্যদের খেতে দিয়ে আগে পরীক্ষা করে নিতেন। মাঝে মাঝে কালো সুন্দরী নিজে হুইস্কির বোতল থেকে এক চুমুক খেয়ে বলত যে এটা একটু অন্যরকম লাগছে। এটা খাওয়ানো যাবে না। মাঝে মাঝে কালো সুন্দরী অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভান করত যে বোতলে কোনো স্লো পয়জন মেশানো আছে। তার এই আচরণে ইয়াহিয়া আরো নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সত্যিই কেউ তাকে বিষপানে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে।'

রানি আরো বলে যে, 'আমি নিশ্চিত এই কালো সুন্দরী বাংলা থেকে কোনো কালো জাদু শিখে এসেছিল। আমাদের বাবা মা দাদা দাদিরা প্রায় বলত যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন কোনো পুরুষ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলায় যায় তখন সেখানকার মেয়েরা এই পুরুষদেরকে কালো জাদুর প্রভাবে দিনের বেলা ছাগল আর গরু বানিয়ে দেয় আবার রাতের বেলা তাদের কাজের জন্য পুরুষগুলো মানুষে রূপান্তরিত করে। সেই রকম একজন কালো জাদুকর মহিলার কথা আমি মুরব্বিদের কাছে শুনেছিলাম। এখন আমি তাদের কথার প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করি। সেই কালো জাদুকর মহিলা তার জাদু দিয়ে পুরুষদেরকে ছোট পোকা মাকড়ে পাল্টে ফেলত। তারপর সারাদিন তাদেরকে নিজের অন্তর্বাসে লুকিয়ে রাখত। রাতের বেলা যৌনকর্মের সময় আবার তাদেরকে মানুষে পাল্টে দিত। আমি আগে ভাবতাম এই সব কথা বার্তা সব মিথ্যে আর কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি এটা সম্ভব। ঐ মহিলাটি কালো সুন্দরী–তার কী এমন ছিল? কিছুই ছিল না, হাফ ডজন সন্তান জন্ম দিয়ে– তার শরীরে দেখার মতো আর কিছুই ছিল না। অথচ কী জাদু দিয়ে সে দেশের প্রধান কর্তাকে মুগ্ধ করে দিলে। আর তার শাসনের তিন মাসের মধ্যে প্রধান শাসককে শুইয়ে দিল। পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিল।'

নুরজাহানের বিষয়ে রানির বক্তব্য হলো: 'নুরজাহান ছিল একটা ধাপ্পাবাজ মহিলা। ইয়াহিয়া খান নিজে আমাকে বলেছেন যে নুরজাহানের ভেতরে বাইরে আসলে কিছুই নেই। শুধু ধান্দা করতে চায়। সে আইয়ুব খানকে দিয়ে তার পড়তি ক্যারিয়ারকে আবার জাগাতে চেয়েছিল। ১৯৬৫ এর দিকে এক অনুষ্ঠানে কিছু রণসংগীত শুনিয়ে সে ইয়াহিয়া খানকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। নুরজাহান সব সময় টাকার পেছনে ছুটত। অর্থের প্রতি তার লোভ ছিল

ভয়াবহ। কোনো ব্যবসায়ী তাকে হাজার রুপি দিতে চাইলেই সে ঐ ব্যবসায়ীর সাথে নাচতে নাচতে চলে যেত। আমি ইয়াহিয়া খানের সাথে তাকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। আপনারা কি জানেন প্রথম বৈঠকে সে কী করেছিল। কয়েক লাইন গান গেয়ে সে ইয়াহিয়া খানের কোলের উপর বসেছিল। আমি দীর্ঘদিন ইয়াহিয়া খানের সাথে কাজ করে একটা রুপি উপার্জন করতে পারেনি অথচ মনভুলানো এই ডাইনি গায়িকা নুরজাহান কয়েক বার ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেই কয়েক লাখ রুপি কামিয়ে ফেলল। ইয়াহিয়া খান সরকারি খরচে বেশ কয়েকবার তাকে দেশ বিদেশ ঘুরিয়েছিলেন। সে সরকারি খরচে টোকিও গিয়েছিল। আমাকে একজন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বলেছিল যে নুরজাহান টোকিও গিয়ে কিছুই করেনি। বরং বোকার মতো শুধু মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে কেনাকাটা করেছে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে দু তিন ঘণ্টা দেরি করে স্টেজে গিয়েছিল গান পারফর্ম করতে। ততক্ষণে অনেক মেহমান চলে গিয়েছিল। আর যারা ছিল তারা আচ্ছা করে নুরজাহানকে গালিগালাজ করেছে। পরবর্তী গানের চুক্তিগুলো বাতিল করে দিয়েছিল।'

আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে নুরজাহানকে নিয়ে আরো বিস্তারিত অনেক কিছু আলোচনা করব।

তবে রানির গল্প এখনো শেষ হয়নি। রানি ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত স্বভাব আচার আচরণ নিয়েও অনেক কথা বলেছিল। রানি বলে, 'আমি ইয়াহিয়া খানকে একজন সত্যিকারের পুরুষের মতোই দেখেছিলাম। তার শক্তি সামর্থ্য ছিল দারুণ। আমি তাকে দেখেছি এক বসায় পুরো এক বোতল হুইস্কি শেষ করে ফেললেন। তারপর রাত তিনটা পর্যন্ত নিজের বেডরুমে বান্ধবীদেরকে নিয়ে উদ্যম রাত কাটাতেন। সকাল আটটা পর্যন্ত টানা ঘুমাতেন। ঘুম থেকে উঠে একদম ফ্রেশ। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে নিজের অফিসের ডেস্কে সুটেট বুটেট হয়ে বসে পড়তেন। তার চেহারায় কিংবা চোখে মুখে কোনো ক্লান্তির ছাপ থাকত না। মনে হতো যেন কিছুই হয়নি। যারা বলে যে তিনি একদম বোকা ছিলেন, যুদ্ধের কলা কৌশল কিছুই জানতেন না তারা বোকা। তারা কিছুই জানে না। আমি তাকে খুব ভালো করে জানি। তিনি খুব বাজে আর নোংরা ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথমে তাকে ব্যবহার করে সবরকমের খারাপ কাজ করেছে। তারপর নিজেদের কুকর্মগুলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঢাকার জন্য সমস্ত দোষ ইয়াহিয়া খানের উপর চাপিয়েছে। ইয়াহিয়া খানের দোষ দিয়ে তারা নিজেদের দোষগুলো একদম ঢেকে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদের সকলের মুখোশ উন্মোচন করে দেব।'

'ইয়াহিয়া খানের ভালো গুণের শেষ ছিল না।' রানি বলে 'তিনি প্রচণ্ড বন্ধু অন্তপ্রাণ ছিলেন। যাকে তিনি বিশ্বাস করতেন তার প্রতি খুব অনুগত ছিলেন। তার মতে পদে বসে তাদের বাল্যকালের কোনো সাধারণ বন্ধুর সাথে সাধারণ অবস্থায় দেখা করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি নিজের সমস্ত পুরাতন বন্ধুদের সাথে খুব আন্তরিকভাবে দেখা করতেন। সে পুলিশের কনস্টেবল হোক কিংবা কোনো অধস্তন জোয়ান। নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে তিনি পুরাতন বন্ধুদেরকে জড়িয়ে ধরতেন। সে যেই হোক না কেন। তার ক্ষমা করে দেয়ার মতো আশ্চর্য একটা গুণ ছিল। তিনি যদি চাইতেন তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সব সময় ভাবতেন নিশ্চয়ই ভালো একটা পথ বের হয়ে আসবে। তখন তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সব কিছু মিটমাট করে ফেলতে পারবেন। আমি নিশ্চিত যদি ইয়াহিয়া খানের উপর সেই শয়তানি প্রভাব আর কালো জাদুর আছর না পড়ত তাহলে পাকিস্তানকে নিয়ে এমন মর্মন্তুদ একটা পরিণতি কিছুতেই হতো না। ইয়াহিয়া খান কখনোই স্বৈরশাসক হতে চাননি। যদি তিনি সেটা চাইতেন তাহলে পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতো না।'

'আমি ইয়াহিয়া খানের পক্ষ নিয়ে কিংবা তাকে রক্ষা করার জন্য কিছু বলছি না। খোদাকে ভয় করে এমন মুসলমানদের জানা উচিত যে এমন কোনো মানুষকে নিয়ে বদনাম করা উচিত নয় যে এখন আর তার বদনামের কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ তিনি এমন জায়গায় চলে গেছেন যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। সবাই জানেন তাকে রক্ষা করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ইয়াহিয়া খান নিজে তার শাসনের শেষ সময়গুলোতে আমার সাথে সব সময় ঝগড়া করতেন। খারাপ আচরণ করতেন আমার সাথে। তার খারাপ গুণগুলোকে আমি যেভাবে ক্ষমা করতে পারি না একইভাবে তার ভালো গুণগুলোও আমি ভুলতে পারি না।'

রানি যা বলেছে সেগুলো নিয়েও বিতর্ক আছে। পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমের মতে রাজনীতিবিদদের কোনো একটা শক্তিশালী অংশ রানিকে দিয়ে এমনটা করিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা একধরনের সংশয় তৈরি করতে চেয়েছিল। তারা জল ঘোলা করতে চেয়েছিল। এই জন্য রানির প্রাপ্তিও কম ছিল না। ইয়াহিয়া খানের সাথে রানির সম্পর্ক নিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল বলেই রানি সেই সময় দারুণ জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতে পেরেছিল। আরাম আয়েশের জীবন যাপনের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। সৌখিন আসবাবপত্র সংগ্রহ করার প্রতিও তার ঝোঁক ছিল। পাক

আফগান সীমান্তে রানি একটা জায়গা কিনেছিল যেখানে ধনী মানুষেরা চোরাই আসবাব কেনার জন্য একত্রিত হতো। তার ঘরে কাপড় চোপড় পোশাকের বিস্তর সংগ্রহ ছিল। একবার এক সাংবাদিক হোটেল কন্টিনেন্টালে তার রুমে গিয়ে কয়েক ডজন দেশি বিদেশি জুতো দেখে অবাক হলে রানি তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'পারফিউম আর জুতোর প্রতি আমার দুর্বলতা অনেক।'

তার এই সব সম্পদ আর বিলাসবহুল জীবনের কথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে যে এই সব তার পূর্বপুরুষের জায়গা জমির সম্পদ। এছাড়া এক বিদেশি প্রকাশক তার স্মৃতিকথা লেখার জন্য তাকে বেশ মোটা অংকের টাকা আগাম দিয়েছিল। সেই অপরিচিত প্রকাশক রানিকে বিভিন্ন পত্রিকায় স্মৃতিকথা লেখার জন্যও পারিশ্রমিক দিয়েছিল। কারণ এতে করে তার আগাম বইয়ের ভালো পাবলিসিটি হবে।

তবে বেশ কয়েক বছর পার হওয়ার পরেও যখন বইটা বের হলো না তখন লোকজন বেশ অবাক হলো। রানিকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল যে টেকনিক্যাল কারণে বইটা প্রকাশ হতে একটু বিলম্ব হচ্ছে খুব শিগগিরই বইটা প্রকাশ হবে। তবে অনেকের মতে সেই সময়ের সরকার চাচ্ছিল না যে এই জাতীয় কোনো বই প্রকাশিত হোক। ফলে সব কিছু থেকে বোঝা গেল যে রানির বিবৃতির শেষ কথাটা এখনও প্রকাশিত হয়নি।

৭

তারা সুখে শান্তিতে জীবন ভোগ করেছিল

ইয়াহিয়া খানকে জড়িয়ে যত নারীদের কথা শোনা যায় তাদের মাঝে নুরজাহান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর বিখ্যাত। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তার উত্থান পতনের গল্পটা সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ।

উদাহরণস্বরূপ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সাথে তার দূরতম সম্পর্কের একটা কথা শোনা যায়। কিন্তু আইয়ুব খানের ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা ভেবে কেউ কখনো চিন্তাও করতে পারেনি যে ১৯৬৫ র যুদ্ধের পর ইয়াহিয়া খানের সাথে তার সম্পর্ক ও সম্মান এতটা উঁচুতে চলে যাবে। এমনকি সিনেমা পাড়ায় একবার গুজব ছড়িয়ে গেল যে ইয়াহিয়া খান ম্যাডাম নুরজাহানকে তার মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেটে পোর্টফোলিও বিহীন মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছেন। এই আইডিয়াটা কেউ কেউ ইয়াহিয়া খানের মাথার ভেতর ঢুকিয়েছিল সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত নুরজাহানের মতো এমন একজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করলে বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের ইমেজ আরো উজ্জ্বল হবে। কারণ এতে করে প্রমাণিত হবে যে পাকিস্তানের সংস্কৃতিক মনোভাব অনেক উন্নত।

কাওয়াকিব নামের লাহোরের একটা বিখ্যাত ফিল্ম ম্যাগাজিন প্রশ্ন রাখল যে, জেনারেল ডি গুল যদি আন্দ্রে মলরক্স নামের একজন সাধারণ লেখককে সংস্কৃতিক মন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারেন তবে ম্যাডাম নুরজাহানের মতো একজন প্রভাবশালী প্রতিভাবান অভিনেত্রীকে মন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন দিতে বাধা কোথায়?

দুটো কারণে এই পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল।

প্রথমত পাকিস্তানের গোঁড়া সম্প্রদায়গুলো এই ধরনের কাজের তীব্র বিরোধিতা করতে পারে,

দ্বিতীয়ত নুরজাহানের নামের সাথে পূর্ববর্তী শাসকদের নামও জড়িত আছে।

কেউ কেউ বলত যে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সাথে নুরজাহানের যেমন ভালো সম্পর্ক ছিল একই সাথে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার সাথেও ভালো দহরম মহরম ছিল।

ইয়াহিয়া খানের শাসনামলের প্রথম দিকে তার সাথে নুরজাহানের সম্পর্ক নিয়ে তেমন কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি।

তবে আল ফাতেহ পত্রিকায় সর্বপ্রথম মালিকায়ে তারান্নুম নামে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এক বান্ধবীকে নিয়ে দারুণ চমকপ্রদ একটা গল্প ছাপা হয়। তার কিছুদিন পর পাকিস্তান টেলিভিশনে নুরজাহানকে নিয়ে বলা হয়, 'একজন নারী যে ইয়াহিয়া খানকে একটা গানের বিনিময়ে পাকিস্তান বিক্রি করে দিতে রাজি করিয়েছে।' নুরজাহান অনেক জনপ্রিয় থাকার কারণে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে জড়িয়ে নুরজাহানের বিরুদ্ধে কিছু বলাটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। শুধু তাই নয় প্রথম যখন এমনটা করা হলো তখন লাহোর যুবলীগ এর বিরুদ্ধে দশ হাজার লোক জড়ো করার ভয় দেখাল। শুধু তাই নয় তারা টিভি স্টেশন ও যে পত্রিকা অফিসগুলো নুরজাহানকে নিয়ে অপপ্রচার করছে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দিল। তবে ১৯৭২ এর পর থেকে ঘটনার মোড় ঘুরতে লাগল অন্যভাবে।

১৯৭২ এসে গল্প ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল যে নুরজাহান সত্যিকার অর্থেই গভীরভাবে ইয়াহিয়া খানের হারেমের সাথে জড়িত ছিল। ফলে ভাসা ভাসা একটা দাবি উঠতে শুরু করল ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ে এবং যে দুর্যোগ পাকিস্তানের উপর নেমে এসেছিল তার ভাগীদার নুরজাহানকেও হতে হবে। এই দাবির উপর আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো কাজ হলো যখন জেনারেল রানি তার সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানকে জড়িয়ে নানা ধরনের গল্প বলা শুরু করল। পত্রিকার খবর, কানাঘুষা গুজব সব কিছুই নুরজাহানের পেশাগত জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সব জায়গায় বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করল। ১৯৭২ এর মাঝামাঝি সময় নুরজাহান বিরোধী একটা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। পাকিস্তানি পত্রিকাগুলো বলতে শুরু করল যে এই আন্দোলন যদি আরো গুরুতর হয় তাহলে নুরজাহান দেশত্যাগ করে ইয়োরোপের কোনো দেশে আশ্রয় নেবে।

কয়েকটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের সাথে সাক্ষাৎকারে নুরজাহান বলল যে কিছু উচ্চপদস্থ পেশাদার অসাধু কর্মকর্তা আর সাংবাদিক ইচ্ছাকৃতভাবে তার ক্যারিয়ারকে কলুষিত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া খানকে জড়িয়ে তার নামে দুর্নাম ছড়াচ্ছে। নুরজাহান অভিযোগ করল যে পত্রিকাওয়ালারা এটাও বলছে যে নুরজাহানের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশের ব্যবসায়িক লেনদেন ও

সম্পর্ক রয়েছে। করাচির একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন দাবি করে যে ১৯৪৮ সনে নুরজাহান বোম্বে থেকে পাকিস্তানে চলে আসে। সে বোম্বে দুটো ফিল্ম হাউস পরিচালনা করত।

এই সব গুজবের বিপরীতে নুরজাহান ঘোষণা করল, 'আমি একটা একটা করে পয়েন্ট বের করে বলতে পারব যে ভারত থেকে আমি একটা টাকাও কখনো উপার্জন করিনি। আমি স্বেচ্ছায় যখন ভারত ছেড়ে চলে আসি তখন লক্ষ লক্ষ রুপি সেখানে ফেলে চলে আসি। ইন্ডিয়াতে আমার গানের যে সব রেকর্ড বাজানো হয় তার জন্য আমাকে রয়্যালেটি হিসেবে একটি রুপিও দেয়া হয় না। ইন্ডিয়ান রেকর্ড ব্যবসায়ীরা আমার রেকর্ড বিক্রি করে যা উপার্জন করছে সেখান থেকেও আমার অংশের কোনো পারিশ্রমিক তারা দেয় না। ভারতের তুলনায় পাকিস্তানে আমি খুব দীন জীবন যাপন করছি। এই সব নিয়ে আমি কখনো কোনো অভিযোগ করিনি। কিংবা আমার শোচনীয় অবস্থা নিয়ে কোনো পত্রিকাও কোথাও কিছু বলেনি। যাই হোক আমার বিরুদ্ধে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি পাকিস্তানি সংগীতের বাজার থেকে আমাকে ছিটকে ফেলার জন্য এই সব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমি বলছি ভাঙা হৃদয় নিয়ে পাকিস্তান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে।'

নুরজাহানের এই সব শক্ত আর দৃঢ় বিবৃতিতে কাজ হলো। সিনেমা পাড়ায় তার শত সহস্র ভক্তকুল রাস্তায় নেমে এল। তারা হুমকি দিল যদি নুরজাহান দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তারা নিজেদের শরীরে আগুন দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ হবে।

নুরজাহান বলেছিল সে যদি দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে লন্ডন কিংবা অন্য কোনো দেশে যাবে। ভারতে সে কিছুতে যাবে না। তখন সংবাদ মাধ্যমগুলো বলতে শুরু করল যে ইন্ডিয়ার সিনেমা পরিচালকরা নুরজাহানকে ভারতে আবার অভিনয় করার জন্য প্রচুর টাকার প্রস্তাব দিয়েছে।

যাই হোক ইয়াহিয়া খানের সাথে নুরজাহানের প্রেমের সম্পর্কের চেয়েও আরো চমকপ্রদ গল্প ছিল। ইয়াহিয়া খানের পতনের পর যে পদ্ধতিতে নুরজাহান আবার নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটা ছিল আরো বিস্ময়কর। নুরজাহানের গান প্রচারের উপর টিভি আর রেডিও যে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ১৯৭৩ এর পর আন অফিসিয়ালি সেই নিষেধাজ্ঞা তারা তুলে নিতে শুরু করল। শুধু তাই নয় পাকিস্তানের টিভি ও রেডিও নুরজাহানকে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রচার করতে শুরু করল।

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভোগ ম্যাগাজিনে নুরজাহানের নাম আসল। পাকিস্তানের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নুরজাহানের সংগীত কিংবা তার উপস্থিতি ছাড়া হবে এটা কল্পনাও করা যেত না।

নুরজাহান সত্যিকার অর্থেই একজন প্রভাবশালী মহিলা ছিল। জেনারেল রানির বিবৃতি মতে সে নুরজাহানকে ইয়াহিয়া খানের সাথে সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তবে অনেক পাকিস্তানির মতে রানির কথাটা ঠিক নয়। রানি নিজেকে একটু ক্ষমতাশালী প্রমাণ করার জন্য এই সমস্ত কথা বাড়িয়ে বলেছে। কারণ ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই নুরজাহানের সাথে পাকিস্তানের অনেক উর্ধ্বতন মহলের পরিচয় ছিল। সে প্রায়ই প্রেসিডেন্ট হাউসে নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী হিসেবে যেত। মাঝে মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের অনেক অনুষ্ঠানে সে গান করত।

যাই হোক নুরজাহান দাবি করে যে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই তার সাথে নুরজাহানের পরিচয় ছিল। গুজরাট ও শিয়ালকোটে ১৯৬৫ এর যুদ্ধের পর সে ইয়াহিয়া খানের সেনাসদস্যদের নানা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শুনিয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের খুব ঘনিষ্ঠ একজন সেনা কর্মকর্তা বলেন যে সেই সময় ইয়াহিয়া খান অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন এবং মেয়ে মানুষের প্রতি তার তেমন দুর্বলতা ছিল না। তারপরেও নুরজাহানের সাথে কথা বলা বা তার সাথে থাকতে পারার ভাবনা তাকে মুগ্ধ করত। ইয়াহিয়া খান এক নৈশভোজে নুরজাহানকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নুরজাহান সেই আমন্ত্রণে ভালোভাবে সাড়া দিয়েছিল। তবে ১৯৭০ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের ব্যবহারে বা আচার আচরণে নুরজাহানকে নিয়ে তেমন অরুচিকর আচরণ লক্ষ করা যায়নি।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে রানির মতামত একদম ভিন্ন। সে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলেছিল যে নুরজাহানকে সে ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক জেনারেল উমরের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে সে নুরজাহানকে ইয়াহিয়া খানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। রানির মতে, 'ত্রিশ বছরের কম মেয়েদেরকে স্পর্শ করা কিংবা তাদের সাথে রাত কাটানোর বিষয়ে ইয়াহিয়া খান খুব রক্ষণশীল ছিলেন। সমাজের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো কম বয়স্ক শুকনো হাড্ডিসার প্রজাপতিগুলোর প্রতি ইয়াহিয়া খানের এলার্জি ছিল। তিনি তাদেরকে পছন্দ করতেন না। তবে মধ্য বয়স্কা নষ্ট ভ্রষ্টা সুন্দরী রমণীরা যারা সত্যিকার অর্থেই জানত যৌনতা কী তাদের প্রতি ইয়াহিয়া খানের আগ্রহের কমতি ছিল না। নুরজাহান এই ধারায় একদম পরিপূর্ণ একজন নারী ছিল। মামু (ইয়াহিয়া খান) যখন রেকর্ডারে নুরজাহানের গান

শুনলেন তখন তিনি নুরজাহানের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তাকে বললাম সে কোনো তরুণী না, সে একজন মধ্য বয়স্কা নারী। হাফ ডজনের উপর স্বামীকে সে তালাক দিয়েছে। এরপরও ইয়াহিয়া খান তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য জেদ করতে থাকলেন। তারপর আমি জেনারেল উমরের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম যেখানে গায়িকা হিসেবে নুরজাহানকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। এ জন্য নুরজাহানকে আমি নগদ ৫ হাজার রুপি দিয়েছিলাম। একই সাথে সমমূল্যের অলংকারও দিয়েছিলাম।'

'নুরজাহান আসল আর ক্ষমতাবান মানুষটাকে এক পলকেই মুগ্ধ করে ফেলল। ইয়াহিয়া খান এই মহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন যার শরীরে কিছু ছিল না শুধু মাত্র গলার স্বরটুকু ছাড়া। যাই হোক ইয়াহিয়া খান নুরজাহানের সাথে টানা পাঁচ ঘণ্টা কাটালেন। তারা জেনারেল উমরের বাসার ছোট্ট একটা সাজানো রুমে একা একসাথে থাকলেন। নুরজাহান পাঁচ ঘণ্টা পর যখন ঘর থেকে বের হয়ে আসল তখন তার টালমাটাল অবস্থা। সে কারো সাথে কোনো কথা বলল না। কারো সাথে কথা বলার মতো অবস্থা তার ছিল না। সেই রাতের পর থেকেই নুরজাহান আমার শত্রু হয়ে গেল। আমার কাছ থেকে সে ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের অলংকার ধার নিয়েছিল। সেগুলো সে ফেরত দেয়নি।'

আবার এই প্রসঙ্গে নুরজাহানের বিবৃতি ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। সে বেশ জোর গলায় বলেছে ইয়াহিয়া খানের সাথে তার কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। করাচির একটি উর্দু সাপ্তাহিকে এক সাক্ষাৎকারে নুরজাহান বলে, 'এক আর্মি জেনারেলের বাসায় অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া খান আমাকে টেনে একটা ছোট্ট রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে সত্যি কথা হলো সেখানে কোনো অনৈতিক কাজ আমাদের মধ্যে হয়নি। কারণ প্রথমত ইয়াহিয়া খান মদ খেয়ে এতটাই মাতাল ছিলেন যে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না আর দ্বিতীয়ত অনৈতিক কোনো ধরনের আচরণ করা থেকে আমি ইয়াহিয়া খানকে বিরত রেখেছিলাম। আমি তাকে সদাচারণ করতে বাধ্য করেছিলাম।'

নুরজাহান দাবি করে যে রানি তার ইমেজটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সে তার নামে অসংখ্য বদনাম আর দুর্নাম ছড়িয়েছিল। এমনটাও দাবি করা হয় যে নুরজাহানের বিরুদ্ধে রানির মিথ্যে প্রপাগাণ্ডার কারণে নুরজাহানের চেয়েও দশ বছরের ছোট তার অভিনেতা পরিচালক স্বামী তাকে ডিভোর্স দেয়ার জন্য হাইকোর্ট থেকে রুল জারি করেছে।

নুরজাহানের দাবি, 'এই রানি সে একটা মিথ্যাবাদী ডাইনি। আমি নিশ্চিত সে শত্রুপক্ষের কোনো এজেন্ট। তাকে প্রেসিডেন্ট হাউসে ইয়াহিয়া খানের

পাশে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল শারীরিক আর মানসিকভাবে ইয়াহিয়া খানকে ভারসাম্যহীন করার জন্য যাতে করে তিনি পাকিস্তানের দুর্যোগের মুহূর্তে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন। এই মহিলা সব শ্রেণির পতিতাদেরকে ইয়াহিয়া খানের পাশে জড়ো করেছিল। যাতে করে ইয়াহিয়া খান এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর রাষ্ট্রের বিষয় নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে না হয়। তার সাথে আমার কাজ করার মতো কিছুই ছিল না। তার সাথে আমার নামটাকে বাজেভাবে জড়ানো হয়েছে কারণ আমি শুধুমাত্র একবার তার জন্য গান গেয়েছিলাম।'

অবশ্য সত্যটা বের করা একটু কঠিনই বটে যে নুরজাহান কি আসলেই ইয়াহিয়া খানের জন্য একবার গান গেয়েছিল নাকি তার সাথে আরো গভীর সম্পর্ক ছিল। তবে প্রেসিডেন্ট হাউসের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বেশ কিছু সাংবাদিকের মতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত নারী আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিল কিংবা সুবিধা গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে নুরজাহানের নাম শোনা যায় না।

বেশি যেটা শোনা যায় নুরজাহান ইয়াহিয়া খানের খুব কাছের লোক ছিল না। ইয়াহিয়া খান নুরজাহানকে পছন্দ করতেন। এই পছন্দের কারণে নুরজাহান দেশের বাইরে নানা রকমের অনুষ্ঠানে যেতে পেরেছিল।

তবে পাকিস্তানে নুরজাহানের জনপ্রিয়তা ছিল সত্যিকার অর্থেই ঈর্ষণীয়। তার বিরুদ্ধে যখন নানা ধরনের প্রচার প্রপাগাণ্ডা চলছিল সেই সময় এক তরুণ একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখলেন যে 'নুরজাহানের সাথে ইয়াহিয়া খানের পরিচয় হওয়ার পর ইয়াহিয়া খান ভালো যে কাজটা করেছিলেন তা হলো তিনি নুরজাহানকে গান গাওয়ার আরো সুযোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া নুরজাহানকে সাহায্য করার মতো তেমন কিছু ইয়াহিয়া খানের ছিল না। বরং উল্টো নুরজাহান গান গেয়ে ইয়াহিয়া খানের ক্রান্তিকালীন সময়ে তার হৃদয়কে প্রশান্ত রেখেছিল।'

ইয়াহিয়া খানের সাথে নুরজাহানের সম্পর্ক যাই হোক না কেন এই সমস্ত দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ার পর নুরজাহানের তৃতীয় স্বামী ইজাজ দুরানি তার ভিআইপি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের পারিবারিক তালাকের নিয়ম অনুযায়ী কোনো স্বামীর পক্ষে শুধু একক সিদ্ধান্তে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে না। সেজন্য উভয়কে ম্যারেজ কোর্টে যেতে হবে।

পাকিস্তানের রেডিও টেলিভিশন নুরজাহানকে বয়কট করতে শুরু করল। নুরজাহান তার বাসা ছেড়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠল। তার স্বামী ইজাজ দুরানি আরেক তরুণী শাহিদা পারভিনের সাথে থাকতে শুরু করলেন।

তবে কিছুকাল পরে হঠাৎ করেই সব কিছু কেমন যেন পাল্টে গেল। সংগীত রানি নুরজাহানের ভাগ্য চাকা ঘুরতে শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সাথে জড়িয়ে বিশাল জনপ্রিয় এই তারকার দুর্নামে লোকজন বিরক্ত হয়ে পড়ল। লোকজনের মনে হতে শুরু করল যে নুরজাহানের মতো একজন বড় মাপের শিল্পী আসলেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। যেভাবেই হোক জনমত ইজাজ দুরানি থেকে সরে এসে নুরজাহানের পক্ষে যেতে শুরু করল। ষাটের দশকে নুরজাহানের সাথে যখন ইজাজ দুরানির পরিচয় হয় তখন তিনি একদম বেনামি আর অপরিচিত একটা মুখ ছিলেন ফিল্ম পাড়ায়। নুরজাহানের জনপ্রিয়তা সেই সময় ছিল আকাশচুম্বি। সেই সময় নুরজাহান তার দ্বিতীয় স্বামী ছবি পরিচালক শওকত রিজভিকে ডিভোর্স দিল। আর ইজাজ দুরানিকে নিজের কাছে টেনে নিল। সেই সময় নুরজাহান বিভিন্ন ধরনের প্রযোজক আর পরিচালকদের ইজাজ দুরানিকে ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করার জন্য চাপ দিয়েছিল। তার এই প্রচেষ্টার কারণে কয়েক বছরের মধ্যে ইজাজ দুরানি পাকিস্তানের মিডিয়ার পর্দায় বেশ জনপ্রিয় একজন অভিনেতা হয়ে উঠলেন।

পাকিস্তান ফিল্ম পাড়ায় জেনারেল রানি যখন নুরজাহানকে নিয়ে কুৎসা গাইতে শুরু করল তার পূর্ব পর্যন্ত নুরজাহানের বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এর পরই ইজাজ দুরানি নড়ে চড়ে বসলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন এত দুর্নাম আর কলংকের বোঝা নিয়ে তিনি কীভাবে সংসার করবেন। তিনি কোর্টের দ্বারস্থ হলেন।

তবে ভাগ্যক্রমে এর পরপরই ঘটনার মোড় ঘুরে যেতে শুরু করল। জনমত নুরজাহানের দিকে যেতে শুরু করল। পাবলিক বয়কটের কারণে ইজাজ দুরানির ছবিগুলো ফ্লপ খেতে শুরু করল। নুরজাহানকে যেসমস্ত ছবির প্রযোজকরা বয়কট করেছিল তারাও সরে আসতে শুরু করল। কারণ নুরজাহানকে বয়কট করার কারণে আরো প্রভাবশালী সংগীত শিল্পীরা সেই সমস্ত প্রযোজকদের ছবিতে গান গাইতে অস্বীকার করছিল। শুধু তাই নয় এমনটাও শোনা গিয়েছিল যে চব্বিশ বছর থেকে শুরু করে সত্তর বছরের পুরুষরা নুরজাহানকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া শুরু করল।

নুরজাহান ইজাজ দুরানির কাছ থেকে তালাক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তবে কোর্ট যখন ইজাজ দুরানির পক্ষে মত দিল তখন নুরজাহান হাইকোর্টের আপিল বিভাগে গেল। আপিল বিভাগ বিষয়টা টেকনিক্যালভাবে ঝুলিয়ে দিল।

তবে এর মধ্যে ইজাজ দুরানি আরেকটা জটিলতা পাকিয়ে ফেললেন। তিনি শাহিদা পারভিন নামে আরেক অভিনেত্রীকে বিয়ে করলেন। পাকিস্তানি পারিবারিক আইন অনুযায়ী কেউ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে না। লোকজন নুরজাহানকে বলল যে এই কারণে ইজাজ দুরানি কারাগারে যেতে পারেন।

এই অবস্থায় ইজাজ দুরানি পাঁচ লক্ষ রুপির বিনিময়ে নুরজাহানের সাথে তালাকের বিষয়টা মিটমাট করতে চাইলেন। কিন্তু নুরজাহান কোর্টে তার কেসটা চালিয়ে যেতে সিদ্ধান্ত নিল।

এর মধ্যেই পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমে আরেকটা খবর বেশ তোলপাড় লাগিয়ে দিল। শাহিদা পারভিনের বাবা মা পুলিশের কাছে অভিযোগ করলেন যে নুরজাহান আর তার সহোযোগীরা তাদের মেয়েকে বাসায় গিয়ে হেনস্থা করেছে। শুধু তাই নয় নুরজাহান তখন শাহিদা পারভিনের সন্তান সম্ভবা বড় বোনকে মেরেছিল। অভিযোগটা পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হলেও রহস্যময় কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানুষের চোখের আড়ালে চলে যায়।

এর কিছুদিন পর আবার নতুন আরেকটা ঘটনা ঘটল।

আগস্টের ১৯৭৩ এর মাঝামাঝি সময়ে নুরজাহান আর রানি এক সাথে সংবাদ সম্মেলন করল। সেখানে তারা ঘোষণা করল যে তাদের মধ্যে এতদিন যা হয়েছে সেটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। তারা দুজন বোন। শুধু মাত্র মিডিয়ার রিপোর্টের কারণে তাদের মধ্যে এই দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তারা সকলের সামনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করল। কিন্তু কিছুদিন পর আবার কিছু একটা মনে হয় তাদের মধ্যে ঘটল। ফলে দুজনার সম্পর্ক আবার বিষিয়ে উঠল। দুজন এমনভাবে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করল যে মনে হলো ইয়াহিয়া খানে উঠে এসে গল্পের বাকি অংশের সমাধান করতে হবে।

তবে ঘটনা যাই হোক এত কিছুর পরেও নুরজাহান আবার নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

১৯৭৩ সনে নুরজাহানের দ্বিতীয় স্বামী শওকত হাবিবের ঔরসে তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। একটা গুজব ছিল যে শুধু মাত্র ইয়াহিয়া খানের জন্য নুরজাহানের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসেনি, তার পরিবারের বিপর্যয়ের জন্য বড় মেয়েও একটা কারণ ছিল। নুরজাহানের স্বামী ইজাজ দুরানি প্রায়ই নুরজাহানকে বলতেন তোমার মেয়েকে অন্য কোথাও রেখে আসো কিংবা বিদেশ পাঠিয়ে দাও। নুরজাহান এতে কিছুতেই সম্মত হয়নি। ফলে মেয়েকে নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। এই ঝগড়ার মধ্যেই হঠাৎ করে

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল আর সংসারের কালো মেঘও হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ের পর পরই ইজাজ নুরজাহানের কাছে তার ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলেন। তিনি এর মধ্যে শাহিদা পারভিন নামে যাকে বিয়ে করেছিলেন যেহেতু পাকিস্তানের পারিবারিক আইন তাকে মেনে নেয়নি তাই সে বিয়েটা ইজাজ বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারলেন না।

নুরজাহান আর ইজাজ এক সাথে বসবাস করতে শুরু করলেন।

৮

ইয়াহিয়া খানের সাক্ষ্য

ইয়াহিয়া খানের ভূত দীর্ঘদিন পাকিস্তানে আস্তানা গেড়েছিলেন। সেটা ক্ষমতায় হোক কিংবা কারাগারে। দীর্ঘদিন ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের দৃশ্যপটে একটা অপরিহার্য চরিত্র ছিল। ক্ষমতা হারানোর দুই বছর পরেও ইয়াহিয়া খান ছিলেন সকলের মুখে মুখে। সংবাদ মাধ্যম ইয়াহিয়া খানের প্রতিটি বিষয় খুঁটিনাটি যাই পেত লিখে ফেলত। কারাগারে তার ব্যক্তিগত জীবনের ছোট একটা ঘটনার সন্ধান পেলেও সেটা বিস্তারিতভাবে গুরুত্বের সাথে লিখত।

ইয়াহিয়া খানের ভবিষ্যৎ পরিণতির সাথে পাকিস্তানের রাজনীতির ভবিষ্যৎ জড়িত ছিল। একই সাথে ভুট্টো তার জনগণকে কীভাবে মোকাবেলা করবেন সেটারও যোগসূত্র ছিল ইয়াহিয়া খানের সাথে।

জনতার আদালতে ইয়াহিয়া খানের বিচারের একটা শক্ত দাবি থাকার পরেও জনাব ভুট্টো বিষয়টাকে দূরদর্শিতার সাথে আর শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন।

পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম ও রাজনৈতিক মহল এটাও ভাবতে শুরু করেছিল পাকিস্তানের পরাজয়ে জনাব ভুট্টোর অবদান কতটুকু ছিল। জল্পনা কল্পনা কেবল রাজনৈতিক কৌতূহলের সাথে সম্পর্কিত ছিল না বরং এটা ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত জীবনের সাথেও সম্পর্কিত ছিল।

ভুট্টো ভেবেছিলেন জনতার আদালতে বিচার হলে যেই গুজব আর জল্পনা কল্পনা ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে রাজনৈতিক মহল আর সংবাদ মাধ্যম তুলেছিল সেটাকে কিছু হলেও দূর করা যাবে।

রাজনৈতিক নাটকীয় মুহূর্ত পট পরিবর্তন এর পরিণতি সব কিছু বিবেচনা করে জনাব ভুট্টো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের বিপর্যয়ে ও এর পরাজয়ের মূলে কী কারণ ছিল সেটা তিনি উদঘাটন করবেন। সে জন্য তিনি একটা উচ্চ স্তরের কমিশন গঠন করেছিলেন। একই সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই কমিশনের কোনো রিপোর্ট তিনি জনগণের সামনে প্রকাশ করবেন না।

বরং এটাকে গোপন রাখবেন। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব হামিদুর রহমান এই কমিশনের প্রধান হিসেবে কাজ করছিলেন। পাকিস্তানের সর্বশেষ যুদ্ধের সাথে জড়িত অসংখ্য লোকজনকে তিনি কমিশনের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। অনেক জেনারেল, রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তি কমিশনের কাছে তাদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খান ও তার আশপাশের খুব কাছের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা কমিশনের সামনে নিজেদের বিবৃতি ও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। জেনারেল রাও ফারমান আলী ও জেনারেল নিয়াজি তখন ভারতের কাছে বন্দী। ভারত সরকার বিশেষ বিবেচনায় রাজনৈতিক পথে তাদেরকে নিজ নিজ রিপোর্ট কমিশনের কাছে উপস্থিত করার সুযোগ দিয়েছিল।

কমিশনের এই পুরো কাজটা পাকিস্তানি সরকার অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করছিল। তারপরেও কমিশনের কিছু রিপোর্ট জনগণের কাছে চলে আসল।

কমিশনের সবচেয়ে বড় নির্দেশনা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তার উচ্চপদস্থ জেনারেলদের কোর্ট মার্শালে বিচার করা। কমিশনকে এটাও বলা হলো যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সার্বিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনা করে নিজের পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। একই সাথে ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ পরিস্থিতিকে খুব বাজেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম পাকিস্তানের বিমান বাহিনীকে সর্বশেষ যুদ্ধে বলতে গেলে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

একই সাথে কমিশনকে জানানো হলো যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দণ্ড দেয়া উচিত।

কমিশন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তার সহযোগী কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেনাকর্মকর্তার বিচারের জন্য উচ্চতর শক্তিশালী ট্রাইবুনাল গঠনের নির্দেশনা দিল।

জনাব ভুট্টো কমিশনের একের পর এক নির্দেশনা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তবে এর মধ্যেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিজেই ভুট্টোর কাছে তাকে বিচার করে দণ্ড দেয়া কিংবা মুক্তির জন্য বার বার চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৭৩ এর অক্টোবরে তিনি ভুট্টোর কাছে সর্বশেষ চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি ভুট্টোর কাছে অনুরোধ করেন পবিত্র রমজান মাসের জন্য তাকে যেন মুক্তি দেয়া হয়। ইয়াহিয়া খানকে যখন কারাগারে আনা হয়েছিল তখন তাকে বলা হয়েছিল যে এটা শুধু মাত্র তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য করা হয়েছে। তবে সাবেক

পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারছিলেন যে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীবলয়ে তার ভয় নেই এবং তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া উচিত।

পাকিস্তানের নাবা এ ওয়াক্ত উল্লেখ করে যে ইয়াহিয়া খানকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তিনি যদি নিজের মুখ বন্ধ রাখতে পারেন তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। যেভাবে প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি রাষ্ট্রের গোপন তথ্য প্রকাশ না করতে শপথ নিয়েছিলেন সেভাবে তাকে চুপ থাকতে হবে।

তবে জনাব ভুট্টো তাকে মুক্ত করতে চাইছিলেন না।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যখন ইয়াহিয়া খানকে গ্রেফতার করা হয় তখন ঘোষণা করা হয়েছিল ডিসেম্বরের পরাজয়ের পেছনে কারা কারা দায়ী ছিল তাদেরকে বের করা হবে এবং জনতার আদালতে প্রকাশ্যে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

পরে বিচার দণ্ডের এই পরিকল্পনা সরিয়ে রাখা হয়। পুরো বিষয়টাকে অনুসন্ধানের জন্য একটা কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কমিশন যখন অনুসন্ধান করে বিচার দণ্ডের সুপারিশ করল তখন এই বিষয়ে জনাব ভুট্টোর নীরবতা আবার সবাইকে কৌতূহলী করে তুলল। পাকিস্তান জুড়ে অনুসন্ধান করে কমিশন কী তথ্য পেল সেটা প্রকাশের তীব্র দাবি থাকা সত্ত্বেও ভুট্টো কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটাও বড় একটা রহস্য হয়ে থাকল।

ভুট্টো কেন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে অনীহা জানাচ্ছিলেন সে বিষয়ে তেহরিকে ইসতিকলাল দলের প্রধান নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন যে ডিসেম্বরের যুদ্ধের সাথে ভুট্টোর অজানা কোনো আতংক জড়িয়ে ছিল। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে যুদ্ধে পরাজয়ের সাথে ভুট্টোর কোনো হাত থাকতে পারে সেটা প্রকাশ হওয়ার ভয়ে ভুট্টো কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে নিষেধ করছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের নিজের বলার মতো গল্প ছিল।

ইয়াহিয়া খানের সাক্ষ্যসহ বিচারপতি হামিদুর রহমানের কমিশনের কিছুই তখনো প্রকাশ করা হয়নি, তারপরেও ইয়াহিয়া খান কমিশনে যা বলেছিলেন তার বিশাল একটা অংশ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

১৯৭২ এর মে মাসে প্রেস এশিয়া ইন্টারন্যাশনালের লন্ডন ভিত্তিক পাকিস্তানি সাংবাদিক আহমেদ মালিক বিচারপতি হামিদুর রহমানের কমিশনে ইয়াহিয়া খান কী বলেছিলেন তা নিয়ে দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টটি একই সাথে ইন্ডিয়াসহ দ্য নিউজ উইক, বিবিসি এবং ফার ইস্টার্ন ইকোনোমিক রিভিউ এর মতো পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হয়।

ভারত পাকিস্তানের শিমলা চুক্তির সময় শিমলাতে আমি অনেক পাকিস্তানি সাংবাদিকদেরকে ইয়াহিয়া খানের সাক্ষ্যের বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম। কাকতালীয়ভাবে শিমলা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য মাদারল্যান্ড, নিউ দিল্লি নিউজ পেপারে ইয়াহিয়া খানের সাক্ষ্যের বিষয়গুলো বিস্তারিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকার এই ধরনের রিপোর্টে পাকিস্তানি আমন্ত্রিত অতিথি ও রাজনীতিবিদরা বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন। রিপোর্টগুলোর মাঝে কিছু বৈষাদৃশ্য নিয়ে আমি যখন আলোচনা তুললাম তখন আমাকে বলা হলো জনাব ভুট্টো এই ধরনের সংশয়পূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে চাচ্ছেন যেন এর সমাপ্তি হয়। পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় বিষয়টা আস্তে আস্তে ধামা চাপা পড়ে যায়।

ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত ইমেজ তত ভালো ছিল না এবং নিঃসন্দেহে ডিসেম্বরের যুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের দুর্বলতার কারণেই পাকিস্তানের উপর দুর্যোগ নেমে এসেছিল। এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখব ইয়াহিয়া খান এই যুদ্ধের পরাজয়ের বিষয়ে বিচারপতি হামিদুর রহমানের কমিশনে কী বলেছিল।

পাকিস্তানি ডিপ্লোমেটিক জোনের সূত্র অনুযায়ী পি এ আই পাকিস্তানি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আহমেদ মালিক উল্লেখ করেন যে ইয়াহিয়া খান দুবার কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি প্রায় সাত ঘণ্টা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সাক্ষ্য দেয়ার সময় ইয়াহিয়া খান যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক ছিলেন এবং ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন এটা বলে যে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তবে তিনি কমিশনকে সর্বোচ্চ সহায়তা করবেন। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য এবং সত্য উদঘাটনের জন্য তিনি সবরকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ইয়াহিয়া খান যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা কমিশনের অন্য সদস্যরা একে অপরে পাল্টাপাল্টি করে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কমিশনের ভাষায় যাকে বলে ক্রস চেক। ইয়াহিয়া খানের সাক্ষ্য কমিশনের কাছে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ইয়াহিয়া খানের সাক্ষ্যের মূল বিষয়গুলোর সারমর্ম ছিল এইরকমঃ

ইয়াহিয়া খান তার সাক্ষ্য শুরু করেন এটা বলে যে তিনি কখনো তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। ১৯৬৯ সনে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় যখন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের ক্ষমতায় পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা চলছিল। তিনি কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। বরং জনতার

উদ্বেগ ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাদের সমর্থনে তিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন।

একদিকে আইয়ুব খান তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন অন্যদিকে সমস্ত রাজনীতিবিদরা তাকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তার শাসনামলের শেষের দিকে পাকিস্তানের ইতিহাসে যে মর্মান্তদ ঘটনা ঘটল তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এটাকে কোনো পৃথক বিষয় হিসেবে না দেখে বরং এটা নিয়ে আরো বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি পাকিস্তানে কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন। তার কট্টর সমালোচকরাও এটা স্বীকার করবেন যে তিনি পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন।

ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন ইয়াহিয়া খান

তিনি আরো বলেন যে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালিদের চাহিদা মেনে নিয়েছিলেন এবং জনগণের সংখ্যার ভিত্তিতে তিনি পাকিস্তান পার্লামেন্টে আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন যে তিনিই সেই ব্যক্তি যে কিনা পাকিস্তানের বিরোধীদের চাহিদা মেনে নিয়েছিলেন এবং চৌধুরী মোহাম্মদ

আলীর শাসনামলে যে এক ইউনিট প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা তিনি রদ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে চারটা প্রদেশে ফেডারেল অটোনোমি প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ইয়াহিয়া খান আরো উল্লেখ করেন যে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে তার উদ্যোগে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির আয়োজন করা হয়। কারণ তিনি ভেবেছিলেন এর মাধ্যমে পাকিস্তানের আসন্ন রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা যাবে এবং শান্তির সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে। কিন্তু এই উদ্যোগ নেয়ার পর বিভিন্ন উৎস থেকে আমাকে সতর্ক করা হলো এমনকি জনাব ভুট্টো আমাকে বললেন যে এভাবে শেখ মুজিবকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে তার পথে চলতে দিলে সেটা খুব ভয়াবহ হবে পাকিস্তানের জন্য ।

ইতোমধ্যে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল যে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্য শত্রুদের সাথে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। তারপরেও ইয়াহিয়া খান আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় বসে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। কিন্তু এই সময় পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো তাকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সম্পূর্ণভাবে বয়কট করার হুমকি দিয়েছিলেন।

১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের এক সম্মেলনে ভুট্টো ঘোষণা দিলেন যে 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কোনো সদস্য যদি ঢাকার অ্যাসেম্বলি সেশনে অংশগ্রহণ করতে যায় তাহলে আমরা তাদের হাত পা ভেঙে দেব।'

শুধু তাই না ইয়াহিয়া খান আরো অভিযোগ করেন যে যদি তিনি ঢাকায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির আয়োজন করেন তাহলে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবেন।

ইয়াহিয়ার মতে এটা ছিল একের পর এক ভয়াবহ পরিণতি তৈরি করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভুট্টোর এই পদক্ষেপের কারণে পাকিস্তানে ধারাবাহিক বিপর্যয়ের শুরু হয়েছিল। যা পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

ইয়াহিয়া খান আরেকটা অভিযোগ করেছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারি গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন যে টিক্কা খান গোপনে ভুট্টোর সাথে হাত মিলিয়ে কিছু পদক্ষেপ নেন যা তার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ ইয়াহিয়া খান বলেন যে টিক্কা খান তাকে কখনো পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো পরিপূর্ণভাবে পাঠাননি। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে টিক্কা খান তাকে বলেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের সব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। পরিবেশ শান্ত। আমি আন অফিসিয়ালি সংবাদটা ভুট্টোকে জানিয়েছিলাম। অথচ আমার

কাছে অন্যান্য উৎস থেকে যে খবর এসেছিল তাতে করে বোঝা যাচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

ইয়াহিয়া খান আরো অভিযোগ করেন যে জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম গোপনে আমার বিরুদ্ধে ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করছিলেন যাতে করে আমি পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি।

তিনি আরো বলেন যে এই ষড়যন্ত্রের পুরস্কার স্বরূপ ভুট্টো ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল গুল হাসানকে চিফ অব আর্মি স্টাফ পদে বহাল করেন এবং এয়ার মার্শাল রহিমকে এয়ার চিফ হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে বলেন। শুধু তাই নয় চিফ অব এয়ারকে বলা হয় তিনি ইয়াহিয়া খান যদি পিছু না হটে তাহলে প্রেসিডেন্ট হাউসে বোম্বিং করা হবে– এই মর্মে যেন হুমকি দেন। ফলে পরবর্তীতে জনাব ভুট্টো ক্ষমতায় বসার পর তার নতুন প্রশাসনে এই দুজনকে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যার যার আসনে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন।

ইয়াহিয়া খান তার সাক্ষ্যে আরো বলেন যে শুধু তাই নয় এই ধারাবাহিকতায় জনাব ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণের পর তার চরিত্রে কালিমা লেপনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তাকে নারী লোভী, যৌনদানব, মাতাল সেনাঅফিসার হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তিনি এই সবের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছেন।

ইয়াহিয়া খান কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী তার চেয়ে ভালো কিছু নয়। এদের অনেক গোপন কর্মকাণ্ড কমিশন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ইয়াহিয়া খানের এই সমস্ত সাক্ষ্যের জন্য পরিস্থিতি এতটাই ঘোলা হয়ে যায় যে ১৯৭১ এ আসলে পাকিস্তানের দুর্ভোগের পেছনে কী ছিল সেটা বের করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছিল।

ইয়াহিয়া খান কমিশনকে বেশ দৃঢ়তার সাথেই অনুরোধ করেন যে তার চরিত্র ও ব্যক্তিগত বিষয়ে যে সমস্ত গল্পগুজব ছড়ানো হচ্ছে সেগুলো যেন দ্রুততার সাথে বন্ধ করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ইয়াহিয়া খান কমিশনের কাছে আবেদন করেন যে কমিশন যেন কিছু পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়। এর মধ্যেছিল– তার চরিত্রহরণের জন্য কিছু ভিত্তিহীন গল্প প্রচারের অভিযোগে পিপলস পার্টির মুখপত্র মুছাওয়াত পত্রিকাটির বিরুদ্ধে যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইয়াহিয়া খান নিজেও জানতেন তার চরিত্রের অবস্থা আশানুরূপ ছিল না। কারণ ক্ষমতার শেষ বছরটিতে তিনি যৌনতা আর মদের জন্য প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া খান নিজের সাক্ষ্যে আরো বলেন যে তিনি শুধু মাত্র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরই শিকার নন বরং একজন পাঠান হওয়ায় তিনি শিয়া ধর্মাবলম্বীদের ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি আরো বলেন যে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে কিছু সূত্র তাকে এই তথ্য দিয়েছিল যে ক্ষমতাবান পাঞ্জাবরা তাকে রিজিওনাল ও সেক্টর গ্রাউন্ড থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু তিনি এই সব তথ্যের বিরুদ্ধে তেমন জোরদার কোনো পদক্ষেপ নেননি। কারণ তিনি নিজেও দীর্ঘদিন ক্ষমতা হস্তগত করে রাখতে চাইছিলেন না।

সবচেয়ে গুরুতর যে অভিযোগ ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোর বিরুদ্ধে করেছিলেন যে ভুট্টো তাকে পররাষ্ট্র বিষয়ে অন্ধকারে রেখেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পাকিস্তানের পক্ষে চীন ও আমেরিকার ভূমিকা কী হবে এই বিষয়ে ভুট্টো তাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ভুট্টো সেই সময় চীনে গিয়েছিলেন। চীন থেকে ফিরে এসে তিনি রিপোর্ট দিলেন যদি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে চীন সরাসরি তার বাহিনী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে যাবে। এই হিসেব নিকেশ করে পূর্ব পাকিস্তানের বাহিনীর উপর শক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। অন্য দিকে জনাব ভুট্টো আমেরিকা থেকেও এই নিশ্চয়তা এনেছিলেন যে নিউইয়র্ক তার সপ্তম নৌবহর খুব শিগগির পাকিস্তানের জলসীমানায় পাঠিয়ে দেবে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান আরো বলেন যে ডিসেম্বরের ৯ তারিখ ভারত পাকিস্তানকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যদি স্বেচ্ছায় ঢাকা ছেড়ে চলে যায় তাহলে ভারতীয় বাহিনী তাদের উপর কোনো অবরোধ করবে না এবং যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদেরকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাবে। কিন্তু ভুট্টোর বাধার মুখে এই প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। কারণ ভুট্টো বলছিলেন ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ তাদের কাছে চীন ও আমেরিকার কাছ থেকে বড় আকারে সাহায্য আসছে। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ ভুট্টো জরুরি খবর পাঠালেন যে পাকিস্তান যেন একটু অপেক্ষা করে কারণ আমেরিকা তাদের সাহায্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। ইয়াহিয়া খান অভিযোগ করেন যে ভুট্টো শুধু মাত্র নিজের ক্ষমতার পথকে পরিষ্কার করার জন্য এই ধরনের ভুয়া খবর পাঠিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্মান ও ক্ষমতাকে খর্ব করেছিলেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় কোনো ভুল ছিল না। তিনি জানতেন যে বড় কোনো ধরনের সাহায্য না আসলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দিয়ে এই যুদ্ধ জেতা সম্ভব ছিল না। এই জন্য তিনি নিজেদের এয়ার ফোর্সকে ব্যবহার করে শক্তিক্ষয় করতে চাননি। কারণ তাকে বোঝানো হয়েছিল ডিসেম্বরের ১০ তারিখের মধ্যে

আমেরিকার সপ্তম নৌবহর তার বিমান বাহিনী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

যাই হোক জেনারেল ইয়াহিয়া খান নানা ধরনের যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে তার যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সঠিক ছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের কারণে পাকিস্তান তার আশানুরূপ ফলাফল পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

এবোতাবাদ কারাগারে থাকাকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তবে অনেকে বলে যে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সেই অঞ্চলে মদ নিষিদ্ধ করেছে। আরো বলা হয় যে এই সময়টাতে তিনি তার নেতৃত্বে সর্বশেষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও নিজের জীবন নিয়ে একটা বই লেখার কাজ করছেন। তবে সকলের ধারণা জনাব ভুট্টো ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে তার এই বই কখনো প্রকাশিত হবে না।

এই সময়টাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত জীবন ও স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছে তা নিয়ে প্রায় প্রতিদিন নানা রকম পত্রিকার প্রথম পাতায় সংবাদ ছাপা হতো।

১৯৭৩ এর জুলাই সংখ্যায় লাহোরের মাশরিক পত্রিকায় সংবাদ বের হয় যে ইয়াহিয়া খানের ক্ষুধা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি বলে যে ইয়াহিয়া খান তার প্রতিদিনের রেশনে আড়াই কেজি গরুর মাংসের কাবাব আর এক বোতল স্কচ বরাদ্দ করতেন। ইতোপূর্বে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পান করতেন বেশি খেতেন কম। তাকে পরামর্শ দেয়া হলো তার খাবার আর পানীয় যেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শুধু তাই ডাক্তার তাকে বলেছেন তার কিডনির অবস্থা খুব খারাপ। পানীয় তাকে বন্ধ করে দিতে হবে।

কারাগারে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি জনাব ভুট্টোর সহনশীল আচরণের কারণে কিছু পত্রিকা তীব্রভাবে ভুট্টোর সমালোচনা করল। লাহোরের নাবাএ ওয়াক্ত উল্লেখ করে কিছু দেশপ্রেমিক সামরিক কর্মকর্তাকে ক্ষুদ্র বিষয়ে বন্দী করে তাদেরকে কারাগারে নির্মমভাবে রাখা হয়েছে সেখানে ইয়াহিয়া খানকে ভিআইপি মর্যাদায় আরাম আয়েশে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

এই রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাস পর পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম ভিন্ন ধরনের আরেকটা সংবাদ প্রকাশ করল। তারা উল্লেখ করল যে ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিজীবনে দারুণ পরিবর্তন হয়েছে।

পিপলস পার্টির মুখপত্র মুছাওয়াত পত্রিকা ১৯৭৩ এর নভেম্বরে একটা সংবাদ প্রকাশ করে। তারা বলে যে সাবেক প্রেসিডেন্ট মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি রোজা রাখছেন।

পরবর্তীতে আরো কয়েকটা রিপোর্টে বলা হয় যে ইয়াহিয়া খান তার পরিবারের সদস্যদের সাথে ঈদ উৎসব পালন করেছেন এবং তিনি সম্পূর্ণ রকম ধার্মিক মানুষে পাল্টে গেছেন।

এর কয়েকমাস আগে পত্রিকাগুলো রিপোর্ট পেশ করে যে এবোতাবাদে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে একটি বাংলোতে বন্দী রাখা হয়েছে। সেখানে তার পরিবারের সদস্যদেরকে তার সাথে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বেগম ইয়াহিয়া তার সাথে আছেন। তিনি নিজ হাতে খাবার তৈরি করে দিচ্ছেন। সেহরির সময় তাকে জাগিয়ে তুলছেন। বেগম ইয়াহিয়া তার স্বামীর সব ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ইয়াহিয়া খানের পারিবারিক এক ঘনিষ্ঠ সূত্র বলে যে রোজার কারণে ইয়াহিয়া খানের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে। তাকে এখন বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হয়। গত তিনবছরে তার স্বাস্থ্যের এত উন্নতি হয়নি।

তার ছেলে আলী ইয়াহিয়া যে কিনা বাবার সাথে কালো সুন্দরীকে নিয়ে ঝগড়া করেছিল সেও বাবার সাথে সব কিছু মিটমাট করে একসাথে বসবাস করছে। প্রথম প্রথম আলী ইয়াহিয়া বাবার জন্য হাল্কা পরিমাণে হুইস্কির জোগান দিত। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আলী ভুট্টো নির্দিষ্ট পরিমাণ হুইস্কি ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠাত। কারণ হঠাৎ করে হুইস্কির পরিমাণ বন্ধ করে দিলে ইয়াহিয়া হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যাবেন।

ইয়াহিয়া খানের সাবেক খানসামা জান মোহাম্মদের বরাত দিয়ে পাকিস্তানি পত্রিকাগুলো বলে যে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ এ ভারতের সাথে যুদ্ধকালে এক বোতল মদ আর আধ বোতল ব্ল্যাক ডগ স্কচ খেতেন প্রতিদিন। তিনি যখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতেন তখন সব সময় জিংকের বোতল তার সামনে রাখতেন। জিংকের সুবিধা ছিল এটা দেখতে বাইরে থেকে সাধারণ পানির মতো ছিল।

কারাগারে থাকা অবস্থায় তার মদ খাওয়ার পরিমাণ কমে গেল। সেটা প্রতিদিন এক বোতল থেকে নেমে এসে সপ্তাহে এক বোতল হলো। তারপর সেটা তিনি এক মাসে নামিয়ে আনলেন। এভাবে তিনি নিজের ধূমপানের অভ্যেসও ত্যাগ করলেন। তার বাংলো থেকে মিসেস ইয়াহিয়া কয়েকশো খালি বোতল বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের ছেলে আলী ইয়াহিয়া তার বাবার পরিবর্তন নিয়ে বলে যে, 'বাবা সব সময় একজন খোদভীরু ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তার প্রেসিডেন্সির সর্বশেষ ছয়মাস কিছু বাজে লোকের সাথে মেশার কারণে তার অবনতি হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দ্রুত সেই অবস্থা থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যা ঘটেছে সেগুলো ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। ফলে যে কেউ প্রত্যাশা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তার ভবিষ্যতের দিকে এগুতে পারে।'

৯.
সর্বশেষ হাসি

ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিজীবন এবং জনতার সাথে তার আচরণ ছিল পারস্পরিক বৈপরীত্যে পূর্ণ। পাকিস্তানের দুর্যোগের দিনগুলোতে আসলেই এর অভ্যন্তরে কী ঘটেছিল তার সত্যিকারের চিত্র বিশ্ব হয়তো কখনোই দেখতে পাবে না।

যাইহোক সাধারণ মানুষের সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় এটা বের হয়ে এসেছিল যে ইয়াহিয়া খান একাই পাকিস্তানি জনগণের দুর্ভোগের জন্য দায়ী ছিলেন। আরেকজন ছিলেন জনাব ভুট্টো যিনি ইয়াহিয়া খানকে দিয়ে পাকিস্তান যা হারিয়েছিল তা উদ্ধার করতে সক্ষম ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের শাসনামলের শেষের দিকে মদ আর নারীর প্রতি তীব্র বাসনাই ইয়াহিয়া খানের পতন ডেকে এনেছিল এবং পাকিস্তানের দুর্যোগের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন।

একজন সুপরিচিত পাকিস্তানি কলামিস্ট এম. এস নাবাএ ওয়াক্ত পত্রিকায় লিখেন যে, 'নিঃসন্দেহে এই লোকটা তার সমস্ত পাপের ভাগীদার ও সমস্ত দুর্ভোগের জন্য দায়ী। একচোখা ইতিহাসবিদদের উচিত এই লোকটাকে নিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ লেখা লিখতে যিনি মদ আর নারীতে বুঁদ হয়ে জাতির জন্য আত্মহত্যামূলক সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন।

কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে ইতিহাসে ইয়াহিয়া খান ছিলেন সবচেয়ে ভয়াবহ মদ্যপায়ী ও নারীলোভী পুরুষ। তার মতো এমনটা আর দেখা যায় না। জনতার আদালতে সকলের সম্মুখে তার বিচার হওয়া উচিত ছিল। যাতে মানুষ দেখতে পারে যে লোকটা পাকিস্তানকে ভূতলে নামিয়ে দিয়েছে তার পরিণতি কী হওয়া উচিত। কিন্তু পাকিস্তানের রক্ষাকর্তারা ভাবলেন হয়তো জনগণ তাদেরকে এমন প্রশ্ন করে বসতে কিংবা এমন দাবি করে বসতে পারে যা তাদের অস্বস্তির কারণ হবে। ফলে এমনটা আর হলো না।'

যাই হোক কলাম লেখক এম. এস ব্যক্তিগত জীবনে মোহাম্মদ সফিউল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের জীবনের সর্বশেষ সময় নিয়ে চমকপ্রদ সংবাদ দিয়েছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান।

পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের সাবেক প্রধান, একই সাথে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান ছিলেন ভুট্টোর শাসনামলের সবচেয়ে শক্ত সমালোচক। একই সাথে তিনি আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানেরও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যদিও ভুট্টো এয়ার মার্শাল আসগর খানের সভায় হামলা করে, তাকে হত্যা করে নানাভাবে তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আসগর খান বিরত হননি।

বরং আর্মড ফোর্সের সাথে তার পূর্বের যোগাযোগ থাকার কারণে তিনি প্রায় সময় যে সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তাগুলো পেতেন সেটাকে খুব আনন্দের সাথে ভোগ করতেন।

নিরাত্তার এই সুবিধাটুকু নিয়ে জনাব আসগর খান ভুট্টোর বিরুদ্ধে কট্টোর সমালোচনায় মেতে উঠেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে যতটুকু সম্ভব দলিল প্রমাণসহ অনেক কিছুই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তার এই সমস্ত লেখা আর চেষ্টার শিরোনাম দিয়েছিলেন তিনি 'ইয়াহিয়া খানের মতো আরেক দানব প্রতিভা' নামে।

তার এই সমস্ত লেখা বক্তব্য পাকিস্তানি কোনো পত্রিকা প্রকাশ করার সাহস করেনি। বরং বেশ সীমিত আকারেই এগুলো প্রকাশিত হতো। বিদেশি পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে তিনি এই সব বলতেন। তার খুঁটিনাটি বক্তব্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কেউ কেউ প্রকাশ করলে সেই সব পত্রিকাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

এয়ার মার্শাল আসগর খান ভুট্টোর বিরুদ্ধে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছিলেন ১৯৭২ এর অক্টোবরে লাহোরে একটা জনসভায়। সেখানে নাবাএ ওয়াক্ত পত্রিকা সূত্র ধরে এয়ার মার্শাল বলেন ১৯৭১ এ এই ভুট্টোর কারণেই ভারতের সাথে পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ভুট্টোই জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেছিলেন। ভুট্টো বলেছিলেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে চীন আর আমেরিকা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে।

এয়ার মার্শাল আসগার ৫০ হাজার লোকের সমাবেশে ভুট্টোকে একেবারে সামনে থেকে সামলোচনা করে বলেন যে 'ইয়াহিয়া খান বোকার মতো অনেকগুলো পাপ করলেও তিনি ভুট্টোর হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। ভুট্টোই জেনারেল ইয়াহিয়া খানের চারপার্শ্বে নানা ধরনের সামরিক বেসামরিক লোকদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসার পর থেকে তার পতন পর্যন্ত এই ভুট্টোই একদম তার কাছকাছি ছিলেন। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতার প্রথম থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।'

ভুট্টো কীভাবে যুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া খানকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন, 'ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ১৯৭১ এর নভেম্বর মাসে বুঝিয়ে পিকিং এ গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ইয়াহিয়া খানকে ভুট্টো বোঝালেন পাক ভারত সংঘর্ষে পিকিং পাকিস্তানের পাশে থেকে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে।'

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে ইয়াহিয়া খান

এই ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় '৭১ এর নভেম্বরে লাহোরে ভুট্টোর এক জনসভায়। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি ইয়াহিয়া খানকে যুদ্ধের কথা বলেছি। ইয়াহিয়ার উচিত যুদ্ধ করা কারণ এখন যুদ্ধের সময়। আমি তাকে বলেছি এখন যদি সে যুদ্ধ না করে তাহলে ঐতিহাসিকরা কিংবা পাকিস্তানের মানুষ কখনো তাকে ক্ষমা করবে না। এখনি তার উচিত জাতির শত্রুদেরকে এমন শিক্ষা দেয়া যা তারা কখনো ভুলবে না। যারা ভারতের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে

তাদের জেনে রাখা দরকার এই যুদ্ধে আমাদের পাশে বিশ্বের শক্তিশালী সব রাষ্ট্র দাঁড়াবে। আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে চাই আমাদের সকল বন্ধুরা সম্ভাব্য সব পথে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।'

ভুট্টোর এই সমস্ত কথা পাকিস্তানের শীর্ষ পত্রিকা মাশরিক অব লাহোর ও ভুট্টোর রাজনৈতিক দল পিপলস পার্টির মুখপত্র মুছাওয়াত বড় বড় শিরোনামে ছেপেছিল। ফলে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন পাকিস্তানের পরাজয় নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে তখন পত্রিকাগুলো এটা বলতে শুরু করল যে 'আমাদের উচিত হবে না পাকিস্তানের পরাজয়ের পেছনে কেবল জেনারেল রানি ও অন্যান্য সুন্দরী মহিলাদেরকে দায়ী করা বরং এই পরাজয়ের পেছনে আরো অনেক ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও দায়ী ছিলেন। '

লাহোরের সমাবেশে এয়ার মার্শাল আসগর খান আরো বলেন, 'যুদ্ধের সময় চীন ভুট্টোকে বলেছিল যে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র বা সমরসঙ্গী হিসেবে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হলো সিংকিয়াং এর কাছে রাশিয়ার সীমান্ত হুমকি। এই কথার পরেও ভুট্টো চাইছিলেন যেভাবেই হোক যুদ্ধটা চলুক। তিনি শুধু ইয়াহিয়া খানকে ভুল বোঝাননি একই সাথে তিনি পাকিস্তান আর চীনের মধ্যেও একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করেছিলেন। শুধু তাই নয় ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ ভুট্টো নিউইয়র্ক থেকে ফিরে এসে জানালেন যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পূর্ব পাকিস্তানে তার সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে পাকিস্তানকে সহায়তা করবেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই কথা শুনে জেনারেল রাও ফারমান আলীর আত্মসমর্পণের পরামর্শটা বাতিল করে দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং প্রেসিডেন্ট হাউসে শ্যাম্পেন আর হুইস্কি দিয়ে তার উদযাপন করলেন। অথচ মূল কথা হলো আমেরিকা তার সপ্তম নৌবহর দিয়ে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি বরং ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণ, যৌক্তিক ও সম্মানজনক আত্মসমর্পণ ও সমঝোতার বিষয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভুট্টোর স্বার্থপর চিন্তা ভাবনার কারণে পাকিস্তানের জন্য এই সুযোগটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

এয়ার মার্শাল আসগর খান চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে তার এই কথায় যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী ভুট্টো তাকে যে শাস্তি দেবেন তিনি মেনে নেবেন।

এই লেখক লাহোরে এয়ার মার্শাল আসগর খানের সাথে মুখোমুখি হলে আসগার খান তখনো বলেন যে ভুট্টো যদি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ঠিকমত পরিচালনা করতে পারতেন তাহলে পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হতো।

আসগর ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার পেছনে একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল।

আসগর খান তার সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেন যে ভারত যদিও মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল কিন্তু এর পরেও যুদ্ধ নিয়ে তারা যথেষ্ট বিব্রত ছিল। কারণ সোভিয়েত সমর্থন কতটুকু আসবে বা কীভাবে আসবে সে বিষয়ে তারা তখন পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিল না। এ ছাড়া নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান চাপে অর্থনীতির চাপের বিষয়টা নিয়েও তারা চিন্তা করছিল। ফলে সব কিছু ঠিক ঠাক রেখে কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া যায় তার একটা রাস্তা ভারত খুঁজছিল। এই অবস্থায় ভারত চীন ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সমর্থনে আত্মসমর্পণের যে প্রস্তাব ইয়াহিয়া খানকে দেয়া হয়েছিল সেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করাই ছিল ইয়াহিয়া খানের একমাত্র পথ।

এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করে তাকে অনুনয় করে বলেছিলেন যে তিনি যেন আপস করেন। আসগর খান আরো দাবি করেন যে তিনি ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেছেন যেন শেখ মুজিবুর রহমানকে ছেড়ে দেয়া হয়, শুধু তাই নয় তিনি শেখ মুজিব আর ইয়াহিয়া খানের মধ্যে একটা মিটিঙের আয়োজন প্রায় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাদের এই কথার মাঝে হঠাৎ করে ভুট্টো এসে হাজির হন। ভুট্টো বলেন যে শেখ মুজিবের সাথে যে কোনো ধরনের আপস হবে পাকিস্তানের আদর্শের বিরোধিতা করা ও পাকিস্তান জাতিসত্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। একই সাথে এই আপসের মাধ্যমে পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাথেও বন্ধুত্ব নষ্ট হবে। ভুট্টো আরো হুমকি দেন যে যদি শেখ মুজিবের সাথে আপস করা হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে যাবে। যেটা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্ট হবে।

এয়ার মার্শাল আসগর খানের কথার সমর্থনে আমি যখন ইসলামাবাদ গেলাম তখন এক পাকিস্তানি সাংবাদিক প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন যে হ্যাঁ ১৯৭১ এর অক্টোবরের মাঝামাঝি একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল। পাকিস্তানি ও বিদেশি কিছু নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ উপায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা খসড়া তৈরি করেছিলেন। কয়েকজন পর্যবেক্ষকের মতে খসড়াটা ড. কিসিঞ্জার তৈরি করেছিলেন। তিনি সেই সময় পাকিস্তানে এসে আবার চীনে গিয়েছিলেন। খসড়া প্রস্তাবটা ড. কামাল হোসেনকেও দেখানো হয়েছিল। তিনি এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই

সময় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বন্দী ছিলেন এবং একই সাথে তিনি আওয়ামী লীগের আইন ও সংবিধান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

সমঝোতা প্রস্তাবের খসড়াটি পাকিস্তানের খ্যাতিমান আইনজীবী এ. কে বারোহি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাকে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকার শেখ মুজিবকে প্রতিহত করার জন্য নিয়োগ দিয়েছিল।

জনাব বারোহি ১৯৭২ এর জুন মাসে করাচির বহুল প্রচারিত আখবারে বারোহি পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে '৭১ এর সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তানি গভর্নমেন্টের মাঝে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমঝোতা প্রায় হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন যে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দারুণ একটা সুযোগ তৈরি হলো। তিনি সব সময় বলেছেন তার দেশের মানুষের প্রতি যেন ন্যায়বিচার করা হয়। তিনি বলেছেন তাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তার আলোচনা হতে পারে।

বারোহি আরো বলেন যে সব কিছুই ঠিকঠাক মতো চলছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ করেই সরকারের অভ্যন্তরের কিছু নেতৃবৃন্দ ও বাইরের কিছু পরামর্শে সব কিছু তালগোল পেকে গেল।

জনাব বারোহি দৃঢ়তার সাথেই বলেন যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের কিছু ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন। তারা যদি ভুল আর দুর্ভাগ্যজনক উপদেশ ইয়াহিয়া খানকে না দিতেন তাহলে পাকিস্তান আজ দুভাগে বিভক্ত হতো না।

এই লেখক ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে যখন প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বহরের সাথে মস্কো গিয়েছিলেন সেখানেও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে খুব শিগগির শেখ মুজিবুর রহমান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে একটা সমঝোতা হতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় একজন সোভিয়েত সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন যে সমঝোতার খসড়া প্রস্তাবটি এই মুহূর্তে সোভেয়েত, ওয়াশিংটন, ইসলামাবাদ ও দিল্লিতে আলোচনাধীন অবস্থায় আছে।

শুধু তাই না ১৯৭১ এর অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংবাদ মাধ্যমেও এটা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হয়েছিল।

এয়ার মার্শাল আসগর খানের মতে এই সমঝোতা প্রস্তাব নষ্ট করে দেয়ার জন্য জনাব ভুট্টো এককভাবে দায়ী ছিলেন। তার মতে এতে করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দুর্বল ও আদর্শগতভাবে বিনষ্ট প্রমাণিত হবে।

একটা পাকিস্তানি সাপ্তাহিক জিন্দেগির মতে ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চীন ও আমেরিকার সহায়তার বিষয়ে কেবল ভুল তথ্যই দেননি বরং একই সাথে ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ ভুট্টো সরাসরি প্রেসিডেন্টকে ফোন করে জানালেন যে ১৫ তারিখের মধ্যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের সাহায্য চলে আসবে চিটাগাং রেঞ্জ দিয়ে আক্রমণ করতে। ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপেক্ষা করতে পারলে যুদ্ধের একটা যৌক্তিক ফলাফল পাওয়া যাবে। এই তথ্য পাওয়ার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান পরবর্তী আরো ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং একই সাথে জেনারেল রাও ফরমান আলীর আত্মসমর্পণের পরামর্শ বাতিল করে দেন।

অবশ্য দ্য জিন্দেগি নামের একটি পত্রিকা এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাদের মতে ইয়াহিয়া খান জেনারেল রাও ফরমান আলীর প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন কারণ তখন তিনি নারী আর মদ নিয়ে এতটাই মাতাল ছিলেন যে এই প্রস্তাব নিয়ে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না।

আবার কিছু কিছু পত্রিকা জনাব ভুট্টোর বিরুদ্ধে ভুল পরামর্শ দেয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল তার বিরোধিতা করেছে।

দ্য পাকিস্তান টাইমস নামের একটি পত্রিকা বলে যে জনাব ভুট্টো তার পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রকম স্বচ্ছ আর সৎ ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে তিনি যতটুকু সংবাদ পেয়েছিলেন তার সবটুকুই ইয়াহিয়া খানকে জানিয়েছিলেন। পিকিং এবং ওয়াশিংটন তাকে যা জানিয়েছিল তিনি সেটাই ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলেন।

এই রকম আরো সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে লেফটেনেন্ট জেনারেল রাও ফরমান আলীর বাসায় এমন কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল যা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সুপার পাওয়াররা পাকিস্তানের আত্মসমর্পণটা দেরিতে হোক এটা চাইছিলেন।

১৯৭২-এর প্রথম দিকে কয়েকটা আমেরিকান সংবাদপত্র রিপোর্ট প্রকাশ করে যে ঢাকায় ইউ এস কনসুলেট জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের বিষয়টা আরো বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

আরো অভিযোগ করা হয় যে এই সময় আমেরিকার সি আই এ এজেন্ট ঢাকায় তখন আরো ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ করতে চাইছিল। তাদেরকে সহায়তা করছিল দুটো ভয়ংকর সংগঠন আল বদর ও আল শামস।

ঢাকায় ইউ এস কনসুলেট তখন সি আই এ'র হাতের পুতুল হয়ে কাজ করছিল। সি আই এ এবং অন্য দুটি সংগঠন আল বদর ও আল শামসের

নেতৃত্বে ঢাকার শীর্ষ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় এই সময়। একই সাথে আরো অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকার কাছে মোহাম্মদপুরে স্বাধীনতার যুদ্ধের পর তাদের গণকবর আবিষ্কার করা হয়।

ঘটনা যাই হোক এই সমস্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সত্য কথা হলো অধিকাংশ শিক্ষিত পাকিস্তানির মতে বিশেষ করে সেনা অফিসারদের মতে ভারতের শর্ত অনুযায়ী যদি পাকিস্তান আরো আগেই আত্মসমর্পণ করত তাহলে পাকিস্তানি সৈন্য ও সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কম হতো।

তবে সাধারণ মত হলো এই সমস্ত ঘটনার জন্য ইয়াহিয়া খানকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ তিনি সেই সময় জেনারেল রাও ফরমান আলীর আত্মসমর্পণের পরামর্শটুকু গ্রহণ করেননি। এমনকি রাও ফরমান আলীকে সমর্থন জানিয়ে জেনারেল নিয়াজির অনুরোধও ইয়াহিয়া খান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তবে এত প্রমাণাদি থাকার পরেও এবং ইয়াহিয়া খানের চারিত্রিক অবনতি ও পদস্খলনের পরেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান সকল স্বৈরশাসকদের উপর তার শেষ হাসিটুকু হাসার সুযোগ হয়তো পাবেন।